হিন্দুধর্ম কী?

হিন্দুধর্ম কী?

মহাত্মা গান্ধী

অনুবাদ

মহাশ্বেতা দেবী

ভারতীয় অনুসন্ধান পরিষদের পক্ষে

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া

মুখবন্ধ

মহাত্মা গান্ধীর 125-তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বৃহত্তর পাঠকগোষ্ঠীর কাছে তাঁর হিন্দুধর্ম বিষয়ে বলিষ্ঠ চিন্তাধারা তুলে ধরতে পেরে সবিশেষ আনন্দ অনুভব করছি। এই সংগ্রহে যে নিবন্ধগুলি সন্নিবেশিত হয়েছে তা 'ইয়ং ইণ্ডিয়া', 'হরিজন' ও 'নবজীবন'-এ প্রকাশিত গান্ধীজীর হিন্দী ও গুজরাতি ভাষায় লেখা বিভিন্ন রচনা। যদিও সেসব রচনা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ঘটনার সূত্রে লেখা, কিন্তু সেগুলি হিন্দুধর্মের এমন এক ছবি তুলে ধরে যার ঐশ্বর্যকে অস্বীকার করা যাবে না, যার সর্বব্যাপকতা এবং মানুষের অস্তিত্ব বিষয়ে সত্তাজনিত উভয়সঙ্কট বিষয়ে সজাগতাও অন্যত্র পাওয়া যাবে না।

'হিন্দুধর্ম কী?' গ্রন্থে মহাত্মাজীর চিন্তাভাবনা যে কোন যুগেই বা সর্বকালেই প্রাসঙ্গিক এবং আমার মতে ইতিহাসের বর্তমান সন্ধিক্ষণে তা আরও বেশি গুরুত্বময়।

এই সংকলনটি প্রকাশ করার ব্যাপারে আমি আমার নেহরু সংগ্রহালয়ের সতীর্থ এবং এর উপনির্দেশক ডঃ হরিদেব শর্মার প্রভূত সাহায্য পেয়েছি। ভারতীয় ইতিহাস অনুসন্ধান পরিষদের তরফ থেকে আমি ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টের কাছেও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি এতো অল্প সময়ে এই গ্রন্থ প্রকাশের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য।

রবীন্দ্রকুমার
অধ্যক্ষ
ভারতীয় ইতিহাস অনুসন্ধান পরিষদ

সূচীপত্র

1

হিন্দুধর্ম কী?

হিন্দুধর্মের কোন সুনির্দিষ্ট মতবাদ নেই, সে তার সৌভাগ্য, অথবা দুর্ভাগ্য। তাই, কোন ভুল বোঝাবুঝি বাঁচানোর জন্য আমি বলেছি, সত্য আর অহিংসাই আমার ধর্মমত। হিন্দুধর্মমত ব্যাখ্যা করতে বললে আমি শুধু বলব অহিংসার পথে সত্যের সন্ধান। কোন মানুষ ঈশ্বরে বিশ্বাস না করেও নিজেকে হিন্দু বলতে পারে। অক্লান্ত সত্যান্বষাই হিন্দুধর্ম। আজ যদি তা মরণোন্মুখ, নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে, বড় হবার ডাকে সাড়া না দেয়,—তবে বুঝতে হবে আমরাই শ্রান্ত হয়ে পড়েছি। এ ক্লান্তি কাটাতে পারলে হিন্দুধর্ম এমন দীপ্তিতে আত্মপ্রকাশ করবে, যেমনটি বিশ্ব আর দেখেনি। সকল ধর্মের চেয়ে হিন্দুধর্ম সহিষ্ণু এ তো বিনিশ্চিত। হিন্দুধর্মমত সকলকে আপন করে নেয়।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, 24 এপ্রিল 1924

2

হিন্দুধর্মে কি শয়তানের কল্পনা আছে?

সকলকে আপন করে আত্মীভূত করে নেয়, আমার মতে হিন্দুধর্মের সৌন্দর্য সেটাই। মহাভারতের পবিত্র স্রষ্টা তাঁর মহান সৃষ্টি সম্পর্কে যা বলেছেন, হিন্দুধর্মের বেলাও তাই সত্য। যে কোন ধর্মে যা সারবস্তু আছে, হিন্দুধর্মেও তা আছে। হিন্দুধর্মে যা নেই, তা অসার ও অপ্রয়োজনীয়।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, 17 সেপ্টেম্বর 1925

3

আমি হিন্দু কেন?

নিজেকে যিনি ভারতের আজীবন বন্ধু বলে থাকেন, তেমন একজন আমেরিকান বন্ধু লিখেছেন :

> যেহেতু হিন্দুধর্ম প্রাচ্যের অন্যতম বিশিষ্ট ধর্ম, এবং যেহেতু আপনি হিন্দু ও খ্রিষ্টান ধর্ম অধ্যয়ন করে সেই অধ্যয়নের ভিত্তিতে বলছেন আপনি হিন্দু, সবিনয়ে শুধাই, এমন নির্বাচনের ব্যাপারে আপনার নিজস্ব যুক্তি কি? হিন্দু ও খ্রিষ্টান দুজনেই উপলব্ধি করে যে, মানুষের প্রধান প্রয়োজন ঈশ্বরকে জানা, কায়মনে তাঁর সেবা করা। খ্রিষ্ট ঈশ্বরেরই এক প্রকাশ, এ বিশ্বাসে ভারতীয়দের খ্রিষ্ট বিষয়ে জানাবার জন্য আমেরিকার খ্রিষ্টানরা হাজার হাজার ছেলেমেয়ে পাঠিয়েছে। প্রত্যুত্তরে দয়া করে আমাদের জানাবেন কি, হিন্দুধর্ম বিষয়ে আপনার নিজস্ব ব্যাখ্যা? —হিন্দুধর্মের সঙ্গে খ্রিষ্টবাণীর এক তুলনামূলক বিচার? এ অনুগ্রহের জন্য আমি সাতিশয় কৃতজ্ঞ থাকব।

বহু মিশনারি মিটিংয়ে আমি ইংরেজ ও মার্কিন মিশনারিদের বলেছি, তাঁরা যদি ভারতকে খ্রিষ্ট বিষয়ে 'বলা' থেকে বিরত থাকতেন—শুধুমাত্র পর্বতশীর্ষের উপদেশ অনুসারে জীবনযাপন করতেন—তাঁদের সন্দেহ করার বদলে, তাঁরা যে ভারতের মানুষের সঙ্গে আছেন, ভারত সেটা যথার্থ উপলব্ধি করত, তাঁদের উপস্থিতি থেকে সরাসরি লাভবান হত। এরকমই মনে করি বলে 'প্রত্যুত্তরে' মার্কিন বন্ধুদের 'বলার' মত কিছু নেই আমার। বিশেষ করে ধর্মান্তকরণের দিকে চোখ রেখে মানুষ অন্যদের নিজ বিশ্বাস সম্পর্কে কথাবার্তা বলুন, তাতে আমি বিশ্বাস

করি না। বিশ্বাস, বিশ্বাসই। তাতে বলাবলির জায়গা নেই। বিশ্বাসমতে জীবনযাপন করতে হয়। তখন আপনা থেকেই প্রচারের কাজ হয়।

আমার জীবন দিয়ে আমি হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যা করতে পারি, আর কোনভাবেই আমি নিজেকে সে কাজের যোগ্য বলে মনে করি না। যদি আমার লেখা দিয়ে হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যা করতে না পারি, তবে তাকে খ্রিষ্টান ধর্মের সঙ্গে তুলনা করতেও পারি না। যা সম্ভব, তা হ'ল, আমি কেন হিন্দু, —তা যত সংক্ষেপে পারি, তাই বলা।

আমি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত প্রভাবে বিশ্বাসী। হিন্দু পরিবারে জন্মেছি, হিন্দুই থেকে গেছি। আমার নৈতিকতাবোধ বা আধ্যাত্মিক উন্নয়নের সঙ্গে তার অসঙ্গতি দেখলে সে ধর্ম ত্যাগ করাই ঠিক হত। পরীক্ষা করে দেখলাম, যত ধর্ম জানি, তার মধ্যে হিন্দুধর্ম সবচেয়ে সহিষ্ণু। এ ধর্ম কট্টরতা থেকে মুক্ত। এ ধর্ম এর প্রবক্তাকে আত্মবিকাশের সুযোগ দেয়। তাই আমার কাছে এর আবেদন খুব জোরালো। এ ধর্ম স্ব-সর্বস্ব নয়। তাই এ ধর্মে বিশ্বাসীদের. অন্য সব ধর্মকে শ্রদ্ধা করতেই শুধু শেখায় না, অন্যান্য ধর্মবিশ্বাসে যা কিছু ভালো, তাকে শ্রদ্ধা ও আত্মস্থ করতেও শেখায়। সকল ধর্মেই অহিংসার কথা আছে। তবে হিন্দুধর্মেই তা সর্বাধিক অভিব্যক্তি পেয়েছে, তার প্রয়োগও হয়েছে। (আমি জৈন ও বৌদ্ধ-ধর্মকে হিন্দুধর্ম থেকে স্বতন্ত্র মনে করি না)। শুধু সকল মানব নয়, সকল প্রাণীর একত্বেই বিশ্বাস করে হিন্দুধর্ম। আমার মতে, মানবতাবাদের বিবর্তনে হিন্দুধর্মের গো-পূজার এক অনন্য অবদান আছে। একত্বে, তথা সকল প্রাণের পবিত্রতায়, বিশ্বাসের এ এক বাস্তববাদী প্রয়োগ। ওই বিশ্বাসের প্রত্যক্ষ পরিণাম হল জন্মান্তরবাদের মহান বিশ্বাস। সবশেষে, অক্লান্ত সত্যানুসন্ধানের মহান ফল হল বর্ণাশ্রম বিধির আবিষ্কার। আবশ্যিক তথ্যগুলির রেখাচিত্রই আঁকছি। এ প্রবন্ধকে ও সবের ব্যাখ্যা দিয়ে গুরুভার করব না। শুধু বলব, গো-পূজা ও বর্ণাশ্রম সম্পর্কে বর্তমান কালের ধারণাগুলি, মূল-এর প্রহসন মাত্র। এই হিন্দুধর্মের যে অনন্যতাগুলি আমাকে ধারণ করে রেখেছে, সংক্ষেপে তার উল্লেখমাত্র করলাম।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, 20 অক্টোবর 1927

4

হিন্দুধর্ম

আমি জোরের সঙ্গে আমার দাবি পেশ করেছি যে, আমি এক সনাতনী হিন্দু, তবু হিন্দুধর্মের নামে যা যা সাধারণত করা হয়, তাতে আমার শ্রদ্ধা নেই। অন্যথায়, সনাতনী বা অন্য কোনরকম হিন্দু বলে অভিহিত হবার ইচ্ছে আমার নেই। তাই সনাতন হিন্দুধর্ম বলতে আমি কি বুঝি, তা পরিষ্কার বলে দেয়া দরকার। সনাতন শব্দটিকে আমি এর প্রকৃত অর্থে ব্যবহার করি।

নিজেকে সনাতনী হিন্দু বলি, কারণ,

1. আমি বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, হিন্দু ধর্মগ্রন্থ বলতে যা কিছু আছে, তাতে বিশ্বাস করি এবং তার ফলে অবতারে ও পুনর্জন্মেও বিশ্বাস করি।
2. বর্ণাশ্রম ধর্মে বৈদিক সংজ্ঞা অনুযায়ী বিশ্বাস করি, এখনকার প্রচলিত বর্বর সংজ্ঞা অনুযায়ী নয়।
3. গো-রক্ষায় আমি বিশ্বাস করি, কিন্তু সে-বিশ্বাস প্রচলিত বিশ্বাসের চেয়ে অনেক বৃহত্তর প্রেক্ষিতে।
4. মূর্তিপূজায় আমার অবিশ্বাস নেই।

পাঠক লক্ষ করবেন, বেদ বা অন্য ধর্মগ্রন্থ বিষয়ে আমি ইচ্ছা করেই দৈবী উৎপত্তি শব্দটি ব্যবহারে বিরত থেকেছি। বেদের অনন্য ঐশ্বরিকত্ব আমি বিশ্বাস করি না। বাইবেল, কোরাণ, জেন্দ্-আবেস্তা, সবই বেদের মতই দৈবী প্রেরণাজাত

বলে আমার বিশ্বাস। হিন্দু ধর্মগ্রন্থে আমার বিশ্বাস এ কথা বলে না যে, প্রতিটি শব্দ বা স্তোত্রকে দৈবী প্রেরণাজাত বলে মানতে হবে। এ সব অসামান্য গ্রন্থ সম্পর্কে সরাসরি জ্ঞান আছে এমন দাবিও আমি করি না। তবে ধর্মগ্রন্থাদির আবশ্যিক শিক্ষার সত্যতা জানি ও বুঝি, এ দাবি করব। যা যুক্তি ও নীতিবোধের কাছে গ্রহণীয় নয়, তেমন ব্যাখ্যার বন্ধন আমি মানি না, সে যত পাণ্ডিত্যপূর্ণই হোক না কেন। বর্তমান শঙ্করাচার্য ও শাস্ত্রীরা (যদি দাবি করেন) যে. হিন্দু ধর্মগ্রন্থের সঠিক ব্যাখ্যা করছেন, সে দাবি আমি একেবারে মানব না। অপরপক্ষে আমি মনে করি, এ সব বই সম্পর্কে বর্তমানে আমাদের যে ধারণা, তা ভয়ানক গোলমেলে। নিষ্পাপতা (অহিংসা), সত্য ও আত্মসংযম (ব্রহ্মচর্য) এসব যারা পূর্ণরূপে আয়ত্ত করেনি, তাদের পক্ষে শাস্ত্র উপলব্ধি সম্ভব নয়, হিন্দুধর্মের এ আপ্তবাণীতে আমার অকাট্য বিশ্বাস আছে। গুরুতে আমি বিশ্বাসী; তবে এ যুগে লক্ষ কোটি মানুষকে গুরু ছাড়াই চলতে হবে। কেননা, পূর্ণ পবিত্রতা ও জ্ঞানের সমাহার এখন দুষ্প্রাপ্য। তবে স্ব-ধর্মের সত্য জানে না বলে কারো হতাশ হবার কিছু নেই। কেননা সকল মহান ধর্মের মত, হিন্দুধর্মেরও মূল সত্যগুলি অপরিবর্তনীয়, সহজেই তা বোঝা যায়। সকল হিন্দুই ঈশ্বরে এবং তাঁর একত্বে, পুনর্জন্মে ও মোক্ষে বিশ্বাসী।

আমার স্ত্রীর বিষয়ে অনুভূতি যেমন, হিন্দুধর্মের বেলাও তেমন—বর্ণনা করতে পারি না। সে আমাকে যেমন বিচলিত করে, বিশ্বের কোন রমণীই তা পারে না। এমন নয় যে তার কোন ত্রুটি নেই। আমি যতটুকু দেখতে পাই, হয়তো তার চেয়ে বেশিই আছে। তবু এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধন অনুভব করি। সকল ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা নিয়েই হিন্দুধর্মের প্রতি আমার অনুভূতি ঠিক ও-রকম। গীতা ও তুলসীদাসের রামায়ণের সংগীতের মতো আর কোন গান আমাকে উদ্বেল করে না। হিন্দুধর্মের শুধু ওই বই দুটি জানি বলে বলতে পারি। যখন মনে হয়েছিল শেষ নিশ্বাস নিচ্ছি, গীতাই ছিল আমার সান্ত্বনা। জানি, আজ বিখ্যাত হিন্দু মন্দিরগুলিতে কি পাপ ঘটছে, তবু এ সব চূড়ান্ত ব্যর্থতা সত্ত্বেও আমি তাদের ভালবাসি। ওগুলিতে যেমন আগ্রহ, তেমনটি অন্য কোন বিষয়ে নেই। আমি এক আমূল সংস্কারক। কিন্তু অত্যুৎসাহের বশে হিন্দুধর্মের সার সত্যগুলি বর্জনের কথাও ভাবিনি। বলেছি, মূর্তিপূজায় অবিশ্বাস নেই আমার। মূর্তি আমার মনে কোন পূজার আবেগ জাগায় না। তবু মনে করি, মানুষী স্বভাবের এক অঙ্গ হল মূর্তিপূজা। আমরা প্রতীকতা খুঁজি কাঙালের মত। অন্য জায়গার চেয়ে গীর্জায়

মানুষ কেমন করে বেশি শান্ত ও সংহত হয়? পূজাকে সহায়তা করে মূর্তি। কোন হিন্দুই মূর্তিকে ঈশ্বর মনে করে না। আমি মূর্তিপূজায় কোন দোষ দেখি না।

এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, হিন্দুধর্ম আত্মসর্বস্ব নয়। তাতে পৃথিবীর সকল মহাপুরুষদের পূজার জায়গা আছে। এটা সাধারণ অর্থে কোন প্রচারমূলক ধর্ম নয়। সন্দেহ নেই যে এ ধর্ম অনেক আদিবাসী গোষ্ঠীকেও আত্মীভূত করেছে, তবে প্রক্রিয়াটি ঘটেছে অলক্ষে, ধীরে, বিবর্তনের মাধ্যমে। হিন্দুধর্ম বলে, যে যার বিশ্বাস ও ধর্ম মতে ঈশ্বর উপাসনা করুক আর এ ভাবেই সকল ধর্মের সঙ্গে তার শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান।

এটাই হল হিন্দুধর্ম সম্পর্কে আমার ধারণা। সেজন্যই আমি কখনো অস্পৃশ্যতা মেনে নিতে পারিনি। মনে করেছি এটা এক অবাঞ্ছিত দুষ্ট উপসর্গ। পুরুষানুক্রমে এটা চলে আসছে, যেমন বহু পাপাচার আজও চলছে। ভাবতে লজ্জা হয় যে, হিন্দুধর্মের এক অঙ্গ ছিল মেয়েদের বেশ্যাবৃত্তিতে নিমজ্জিত করা। তবু ভারতের নানাস্থানে এ কাজে করে থাকে হিন্দুরা। কালীর কাছে ছাগবলিদানকে আমি অধর্ম মনে করি, এ কাজকে হিন্দুধর্মের কোন অঙ্গ বলে মনে করি না। বহুযুগ ধরে হিন্দুধর্ম বৃদ্ধি পেয়েছে। হিন্দুস্থানের মানুষদের ধর্মকে বিদেশীরা বলেছিল হিন্দুধর্ম। কোন সন্দেহ নেই এক সময়ে ধর্মের নামে পশুবলি দেওয়া হত। কিন্তু তা ধর্ম নয়, হিন্দুধর্ম তো নয়ই। তাই মনে হয়, আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে গো-রক্ষা এক পবিত্র বিশ্বাস হয়ে উঠল। যারা গোমাংস খেত, তারা বহিষ্কৃত হয়। নিশ্চয় প্রচণ্ড গণসংঘর্ষ বেঁধেছিল। শুধু অবাধ্যদেরই সমাজে একঘরে করা হয় নি, তাদের পাপের দাম দিল তাদের সন্তানরাও। সদুদ্দেশ্যে যে আচরণ শুরু হয়, দিনে দিনে তা কঠোর হয়ে উঠল। ধর্মগ্রন্থে বহু শ্লোকও সংযোজিত হল। ফলে অস্পৃশ্যতা হল স্থায়ী। এটা অদরকারী, অসংগতও। আমার এ তত্ত্ব ঠিক বা বেঠিক যাই হোক, অস্পৃশ্যতা যুক্তিবাদের, করুণার, দয়ার, বা ভালবাসার কাছে অতীব ঘৃণিত। যে ধর্ম গরুকে পূজা করতে বলে, তা মানুষকে অমন নিষ্ঠুর ও অমানবিক ভাবে বর্জন করতে পারে না। দলিত শ্রেণীর মানুষদের আপনজন বলে স্বীকার করব না? তা হলে আমাকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলুক, আমি খুশি হবো। অস্পৃশ্যতার কলঙ্ক বজায় রেখে মহান হিন্দুধর্মকে অবমাননা করে চললে হিন্দুদের স্বাধীনতায় দাবি থাকবে না, তারা তা পাবেও না। স্বীয় জীবনের চেয়েও হিন্দুধর্মকে ভালবাসি, তাই এ কলঙ্ক আমার

কাছে এক দুঃসহ বোঝা হয়ে উঠেছে। জাতির এক পঞ্চমাংশকে সমান মেলামেশার অধিকারে বঞ্চিত রেখে আমরা যেন ঈশ্বরকে অস্বীকার না করি।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, 6 অক্টোবর 1921

5

সনাতন হিন্দু

যে পত্রলেখক হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যাকে সমালোচনা করেন, তাঁকে গান্ধীজী লেখেন :

আমি সাহিত্যিক নই। তাই বিশ্বের নানা ধর্মগ্রন্থের মর্ম বুঝতে চেষ্টা করি। এইসব ধর্মগ্রন্থ অনুসারে সত্য ও অহিংসার পরীক্ষা করি বোঝার জন্য। সে পরীক্ষার সঙ্গে যা মেলে না, তা বর্জন করি। যা সংগতিপূর্ণ তা আত্মসাৎ করি। বেদ শিক্ষার ঔদ্ধত্যের জন্য রামচন্দ্র এক শূদ্রকে শাস্তি দেন, এ কাহিনীকে আমি প্রক্ষিপ্ত বলে বর্জন করি। আর, সব কিছুর পর আমি রামকে পূজা করি। আমার ধারণায় তিনি এক পূর্ণ মানব। তিনি কোন ইতিহাসের চরিত্র নন, নতুন নতুন ঐতিহাসিক আবিষ্কার ও গবেষণার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে যাঁর জীবনের ঘটনাবলীর ব্যাখ্যাও বদলে যায়। ইতিহাসের রামের সঙ্গে তুলসীদাসের কিছু করার ছিল না। ঐতিহাসিকতার নিরিখে তাঁর রামায়ণ ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দেবার যোগ্য হবে। অন্তত আমার ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার বিচারে তাঁর গ্রন্থ অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তুলসীদাসের রামায়ণ বলে যত সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে, তার প্রত্যেকটির প্রতি শব্দ আমি মানতে পারি না। গ্রন্থটির মধ্যে যে আধ্যাত্মিকতা প্রবহমান, তাতেই আমি মন্ত্রমুগ্ধ। শূদ্রদের বেদপাঠের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আমি সমর্থন করতে পারি না। এ মুহূর্তে আমার মতে, যতদিন আমরা ক্রীতদাস, ততদিন আমরা সবাই মুখ্যত শুদ্র। জ্ঞান কোন শ্রেণী বা সমাজের একচেটিয়া নয়। কিন্তু যারা প্রাক্-প্রশিক্ষণ পায়নি, তারা উচ্চমার্গের সূক্ষ্ম সত্য আত্মস্থ

করবে, এ যে কত অসম্ভব তা আমি বুঝি। যারা প্রাথমিক প্রস্তুতি নেয়নি তারা উঁচু পাহাড়ের সূক্ষ্ম আবহাওয়ায় নিশ্বাস নিতে পারে না। যারা সহজ অঙ্ক শেখেনি, তারা উঁচু ক্লাসের জ্যামিতি বা বীজগণিত বুঝতে পারে না। শেষ অবধি আমি স্বাস্থ্যের কয়েকটি নিয়মে বিশ্বাসী। গায়ত্রী আবৃত্তির বিষয়ে কিছু বিধি আছে। নিয়মমতে স্নান ও প্রক্ষালনের পরে নির্দিষ্ট সময়ে তা আবৃত্তি করতে হয়। এ সব নির্দেশে আমি বিশ্বাস করি। সবসময়ে তা মেনে চলতে পারিনা বলে বহু বছর ধরে আমি পরবর্তী সন্তদের অনুসরণ করি। তাই ভাগবদগীতার দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র, অথবা তুলসীদাসের সহজতর পাঠ, গীতা ও অন্যান্য বই থেকে কিছু নির্বাচিত অংশ, প্রাকৃতে কিছু ভজন, এতেই সন্তুষ্ট থাকি। এগুলোই আমার প্রত্যহের আধ্যাত্মিক পুষ্টি, আমার গায়ত্রী। প্রতিদিন আমার যে সান্ত্বনা ও শান্তি দরকার, এ সবই তা জোগায়।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, 27 আগস্ট 1925

6

মালা না চরকা?

সর্বত্র দেখি দারিদ্র্য, তাই সর্বত্র চরকা দেখতে চাই। ভারতের কঙ্কালসার মানুষদের কাছে ধর্মের কোন মানে থাকবে না ততদিন, যতদিন আমরা তাদের খাওয়াতে পরাতে পারব না। পশুর জীবন যাপন করছে তারা, এবং এ জন্য আমরাই দায়ী। তাই চরকা আমাদের একটি প্রায়শ্চিত্ত। অসহায়কে সেবাই হল ধর্ম। অসহায় ও নিপীড়িতের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর দেখা দেন আমাদের। কিন্তু কপালদোষে আমরা চিনতে পারি না—না তাদেরকে, না ঈশ্বরকে। বেদে ঈশ্বর আছেন, আবার নেইও। যে বেদের মর্মবাণী পাঠ করতে পারে, সে বেদে ঈশ্বরকে দেখতে পায়। যে বেদকে অক্ষরে অক্ষরে অনুধাবন করে, সে এক অক্ষরজীবী। নরসিংহ মেহতা জপমালার যথার্থ স্তুতি গেয়েছেন। আবার সেই নরসিংহই গেয়ে উঠেছেন:

> কি লাভ তিলক ও তুলসীতে, কি লাভ মালা জপে আর নামোচ্চারণে—কি লাভ বেদের বৈয়াকরণিক ব্যাখ্যা—কি লাভ এর পাঠদক্ষতায়? এ তো উদরপূর্তির অছিলা মাত্র। এ যদি পরাব্রহ্ম উপলব্ধিতে সহায়তা না করে, এ সবের কোন মূল্য নেই।

মুসলিম তসবিমালার পুঁতি গোণে, খ্রিষ্টান তার জপমালার। তবে যদি কাউকে সাপ কামড়ায়—তখন তস ও জপমালা জপছিল বলে সর্পদংশিত ব্যক্তির সাহায্যে যদি দৌড়ে না যায়, দুজনের মনে হবে তারা ধর্মে পতিত হয়েছে। শুধুমাত্র বেদজ্ঞান ব্রাহ্মণদের ধর্মাচার্য বানায় না। তা যদি হত, তাহলে ম্যাক্স ম্যুয়েলারই তা হতেন। যে ব্রাহ্মণ আজকের ধর্ম বোঝে, সে বেদ শিক্ষাকে দ্বিতীয় স্থান দেবে

আর চরকার ধর্ম প্রচার করবে, এবং তাতে কোটি কোটি দেশবাসীর ক্ষুধা উপশম হবে, এবং যখন তা হবে, একমাত্র তখনই সে বেদচর্চায় ডুবে যাবে।

নামীদামী ধর্মচর্চার চেয়ে চরকা কাটাকে আমি নিশ্চয় শ্রেষ্ঠতর মনে করি। তার মানে এই নয় যে, ওটি করব না। আমি বলতে চাই, সকল মতের ধর্মানুসারীরা যে-ধর্ম মেনে চলে, সে-ধর্ম সবার উপরে। তাই বলি, সেবার মনোভাব নিয়ে চরকা কাটলে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠতর ব্রাহ্মণ হয়, মুসলমান হয় আরো ভাল মুসলমান, বৈষ্ণব হয় আরো ভাল এক বৈষ্ণব।

বিছানায় শুয়েও চরকা কাটছি এ যদি সম্ভব হত এবং তাতে ঈশ্বরের প্রতি মনোনিবেশে সহায়তা হচ্ছে, এমন যদি মনে করতাম, তাহলে নিশ্চয় জপমালা রেখে আমি চরকা ঘোরাতাম। যতদিন দেখব দেশ দারিদ্র্য ও উপবাস কবলিত, —চরকা ঘোরাবার শক্তি যদি থাকে এবং জপমালা জপা ও চরকা কাটা, এর একটি যদি বেছে নিতে হয়—আমি চরকাকেই করে নেব আমার জপমালা। তেমন সময়ের প্রতীক্ষায় আছি, যখন রামনাম উচ্চারণও হয়ে উঠবে বাধা। যখন বুঝব, রামনাম উচ্চারিত ভাষাকেও ছাড়িয়ে যায়, আমার ও নাম উচ্চারণের দরকারই হবে না। চরকা, জপমালা ও রামনাম আমার কাছে সবই সমান। ওরা একই উদ্দেশ্যে কাজ করে, আমাকে সেবাধর্ম শেখায়। সেবাধর্ম অভ্যাস না করে আমি অহিংসা অনুশীলন করতে পারি না, আর অহিংসা ধর্ম অনুশীলন না করলে সত্যের সন্ধান পাই না। সত্য বিনা আর কোন ধর্ম নেই। সত্যই রাম, নারায়ণ, ঈশ্বর, খুদা, আল্লা, গড। (নরসিংহ যেমন বলেছেন, 'সোনার গড়ন যাই হোক, তার নাম বা আকার যাই হোক, শেষ অবধি তা সোনাই থাকে"।)

ইয়ং ইণ্ডিয়া, 14 আগস্ট 1924

7

ছোঁয়াছুঁয়ি

আমরা, হিন্দুরা, ধর্মের নামে বহিরাচরণে অন্ধভক্তি দেখাই। খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারেই যেন ধর্ম নিহিত, এমনটা করে ধর্মকে ছোট করেছি। ব্রাহ্মণত্বের যে অবিসংবাদী অবস্থিতি, তার কারণ তার আত্মসংযম, অন্তরের পবিত্রতা, কঠোর কৃচ্ছসাধন—এবং এ সকলই জ্ঞানের আলোয় প্রদীপ্ত। খাদ্য ও ছোঁয়াছুঁয়ির ফলাফলের ওপর অহেতুক গুরুত্ব আরোপ করলে হিন্দুরা ধ্বংস হয়ে যাবে। অন্তরের সংকট ও প্রলোভনের মধ্যেই ধৃত আমরা—আমাদের স্পর্শ করছে, দূষিত করছে ঘৃণ্য ও দূষিত চিন্তাপ্রবাহ। এমন সময়ে, অজ্ঞতা ও অহংকারের কারণে যাদের নিজেদের চেয়ে নিকৃষ্ট মনে করি, তাদের সংস্পর্শে এলে যে কি হবে তা ভেবে যেন বাড়াবাড়ি না করি। সর্বশক্তিমানের সিংহাসনের সামনে আমাদের বিচার হবে। বিচারের মানদণ্ড হবে, কারা আমাদের কি ভাবে সেবা করেছে। একটি মানুষের সেবাও যদি করে থাকি, ঈশ্বরের করুণা পাব। আমরা খারাপ, উত্তেজনাবর্ধক ও নোংরা খাবার বর্জন করব, কুসংসর্গ করব পরিহার। কিন্তু এ সবকে কথাকে যেন মাত্রাছাড়া গুরুত্ব না দিই। জোচ্চোরি, কপটতা বা তার চেয়েও নিকৃষ্ট দোষ চাপা দেবার জন্য কয়েক রকম খাদ্য ত্যাগ করতে সাহস করি না। অধঃপতিত ও কলঙ্কিত ভাইয়ের সংস্পর্শে আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতিতে ব্যাঘাত ঘটবে বলে তার সেবা করতে নারাজ হতে পারি না।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, 5 জানুয়ারি 1922

৪

আমার কর্তব্যকর্ম

মহাপুরুষদের সঙ্গে এক নিশ্বাসে আমার নামও উচ্চারিত হবে, আমি নিজেকে ততটা যোগ্য মনে করি না। আমি এক দীন সত্যসন্ধানী। এ জীবনেই মোক্ষ লাভ করতে চাই। আত্মোপলব্ধির জন্য আমি অধীর। স্বীয় আত্মাকে দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত করার জন্য যে প্রশিক্ষণ নিচ্ছি, জাতিকে সেবা তারই এক অংশ। এ ভাবে দেখলে আমার কাজকর্মকে স্বার্থপর মনে হতে পারে। পৃথিবীর নশ্বর সাম্রাজ্যে কোন লোভ নেই আমার। আমি চেষ্টা করছি স্বর্গের সাম্রাজ্য পেতে, যা হ'ল মোক্ষ। এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কোন গুহায় গিয়ে আশ্রয় নেবার দরকার নেই আমার। অন্তরেই তেমন এক আশ্রয়স্থল বহন করি, পথটা যদি জানতাম! এক গুহাবাসী বাতাসে দুর্গ গড়তে পারে। জনকের মত এক প্রাসাদবাসীর গড়বার মত তেমন কোন দুর্গ নেই। যে-গুহাবাসী কল্পনার ডানা মেলে বিশ্বে উড়ে বেড়ায়, সে কোন শান্তি পায় না। একজন জনক, ঐশ্বর্য ও আড়ম্বরের মধ্যে থেকেও এমন শান্তি পেতে পারেন যা চিন্তা করা যায় না। দেশের জন্য তথা মানবতার জন্য ক্লান্তিহীন কাজ করে চলাই আমার কাছে মুক্তির পথ। প্রাণময় সব কিছুর সঙ্গেই মিশে যেতে চাই আমি। গীতার ভাষায়, শত্রু ও মিত্র, উভয়ের সঙ্গেই শান্তিতে থাকতে চাই। যদিও সেজন্য আমাকে তাচ্ছিল্য ও ঘৃণা করতে পারে কোন মুসলমান বা খ্রিষ্টান, বা হিন্দু। যদি কেউ আমায় ঘৃণাও করে, তবু নিজের বউ-ছেলেকে যেমন ভালবাসি, তাকেও তেমনি ভালবাসতে ও সেবা

করতে চাই। চিরস্বাধীনতা ও চিরশান্তির দিকে যাত্রাপথের একটি অধ্যায় মাত্র আমার দেশপ্রেম। তাহলেই দেখা যাবে, আমার কাছে ধর্মশূন্য কোন রাজনীতি নেই। ওরা ধর্মকে দাবিয়ে রাখে। ধর্মবিরহিত রাজনীতি এক মৃত্যুফাঁদ। তা আত্মাকে হনন করে।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, 3 এপ্রিল 1924

9

শুদ্ধি ও উদ্ধার

খ্রিষ্টান ধর্মে, খানিকটা ইসলামেও, ধর্মান্তকরণ বলতে যা বোঝায়, হিন্দুধর্মে তা নেই বলেই আমার বিশ্বাস। আমার মনে হয়, আর্যসমাজ তার প্রচারের পরিকল্পনার ক্ষেত্রে খ্রিষ্টানদের কিছুটা অনুকরণ করেছে। আধুনিক পন্থা আমার মনপছন্দ নয়। এতে ভালোর চেয়ে ক্ষতিই হয়েছে বেশি। যদিও মনে করা হয়েছে, এ শুধুমাত্র হৃদয়ের প্রসঙ্গ, স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে এর অবস্থিতি, কিন্তু তার অধঃপতন ঘটেছে এক স্বার্থসর্বস্ব প্রবৃত্তির আবেদনের কাছে। আর্য সমাজের প্রচারককেও তেমন সন্তুষ্ট হতে দেখা যায় না যখন তিনি অন্যান্য ধর্মের বিরুদ্ধে কুৎসা রচনা করতে থাকেন। আমার হিন্দু মানসিকতা বলে, সকল ধর্মই কমবেশি সত্য। সকলে একই ঈশ্বর দ্বারা সৃষ্ট, কিন্তু তারা যেন খুঁতপূর্ণ মানব যন্ত্র মাত্র। স্ববিশ্বাসে, ত্রুটিমুক্ত সম্পূর্ণতায় পৌঁছবার চেষ্টা যদি সবাই করে, সেটাই হবে প্রকৃত শুদ্ধি আন্দোলন। তেমন এক পরিকল্পনায় চরিত্র হবে একমাত্র পরীক্ষার বস্তু। নৈতিক উন্নতিই যদি না হয়, কি হবে একের পর এক মত পরিবর্তনে? ঈশ্বর সেবার কাজে আমি নিযুক্ত হতে চাই (শুদ্ধি বা তবলিঘের মমার্থ নিশ্চয় তাই), কিন্তু আমার ধর্মাবলম্বী যারা, তাদের কাজকর্ম যদি নিয়ত ঈশ্বরকে উপেক্ষাই করে, তা হলে কি লাভ তাতে? 'চিকিৎসক! নিজেকে সারাও' কথাটি পার্থিব বিষয়ের চেয়ে ধর্মীয় বিষয়ে অধিকতর প্রযোজ্য। তবে এ আমার দৃষ্টিভঙ্গি মাত্র। আর্যসমাজীরা যদি মনে করেন যে তাঁরা বিবেকের আহ্বান শুনেছে, আন্দোলন

চালিয়ে যাবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে তাঁদের। তেমন এক প্রজ্বলন্ত আহ্বান সময়সীমা অথবা অভিজ্ঞতাপ্রসূত বাধা মানে না। অন্তরের আহ্বান শুনে কোন আর্যসমাজী বা মুসলিম প্রচারক যদি স্ববিশ্বাস প্রচার করে, এবং সে কারণে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য বিপন্ন হয়, সে ঐক্য তো অতি ভঙ্গুর। তেমন সব আন্দোলন দেখে আমরা বিচলিত হব কেন? তবে ও সব আন্দোলন যেন সাচ্চা হয়। মালকানারা যদি হিন্দুধর্মে ফিরে আসতে চায়, যখন ইচ্ছে, তখনি তা করবার পূর্ণ অধিকার আছে তাদের। কিন্তু অন্যান্য ধর্মকে হেয় প্রতিপন্ন করে, এমন কোন প্রচার চলতে দেওয়া যায় না। তা করলে ধর্মসহিষ্ণুতাকে নাকচ করা হবে। অমন প্রচারকার্য বিষয়ে শ্রেষ্ঠ উপায় হল, প্রকাশ্যে তাকে ধিক্কার দেওয়া।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, 29 মে 1924

10

হিন্দুদের করণীয় কি ?

যদিও ভারতের অধিকাংশ মুসলিম ও হিন্দু একই জায়গা থেকে উদ্ভূত ধর্মীয় পরিবেশ তাদের মধ্যে পার্থক্য এনেছে। বিশ্বাস করি, চোখেও দেখেছি, চিন্তাধারা মানুষের চরিত্র কেন চেহারাকেও পালটে দেয়। শিখরা তার অধুনাতম উদাহরণ। মুসলমানরা সাধারণত সংখ্যালঘু, ফলে তারা পরিণত হয়েছে উৎপীড়কে। এ ছাড়াও, নবীন এক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী সে, তাই, তুলনামূলকভাবে এক নতুন জীবন ধারার বলিষ্ঠতা দেখা যায় তার মধ্যে। যদিও আমার মতে কোরাণে অহিংসার স্থান খুব উঁচুতে, তেরোশো বছরের সাম্রাজ্য বিস্তার মুসলমানদের যোদ্ধা বানিয়ে ফেলেছে। তাই তারা একরোখা। একরোখামির স্বাভাবিক প্রকাশ হল উৎপীড়ন। হিন্দুর আছে এক সুপ্রাচীন সভ্যতা। মূলত সে অহিংস। ওই দুটি অধুনাতম সভ্যতা এখনো যে সব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে চলছে, হিন্দু সভ্যতা সে সব অভিজ্ঞতা অতিক্রম করে এসেছে। সাম্রাজ্যবাদী বলতে এখন যা বোঝায়, হিন্দুত্বের মধ্যে যদি একদা তা থেকে থাকে, এখন সে তা পিছনে ফেলে এসেছে। ত্যাগ করেছে সাম্রাজ্যবাদ, তা স্বেচ্ছায় হোক, বা কালের নিয়মে হোক। অহিংসার প্রভাব এক ছোট সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর হাতিয়ার চালানোকে সংযত করেছে। যে সামাজিক শক্তি আধ্যাত্মিকতায় উন্নত, জ্ঞানী ও নিঃস্বার্থ, ওই সংখ্যালঘু গোষ্ঠী সর্বদা তার অধীনে থাকবে। তাই হিন্দুরা লড়াই করার মানসিকতা সম্পন্ন নয়। তবে আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ তো ধরে রাখতে পারে নি। ফলে হাতিয়ারের পরিবর্তে

যে কার্যকর পন্থা পেল—তার ব্যবহারই ভুলে বসে আছে। ব্যবহারটাই জানে না, সেদিকে খুব দক্ষতাও নেই, ফলে নিরীহ হতে হতে তারা ভীরু কাপুরুষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটা নম্রতা-সহিষ্ণুতার স্বাভাবিক এক বিশ্রী পরিণতি। নিঃসন্দেহে হিন্দু স্বাতন্ত্র্য খারাপ, কিন্তু তার সঙ্গে হিন্দু ভীরুতার যোগ আছে বলে মনে করি না। আত্মরক্ষার জন্য আখড়াতেও আমার আস্থা নেই। শরীরচর্চার জন্যে তা ভাল, কিন্তু আত্মরক্ষার জন্য আমি আধ্যাত্মিক চর্চাকে ফিরিয়ে আনতে চাই। আত্মশুদ্ধি হল সর্বশ্রেষ্ঠ ও স্থায়ী আত্মরক্ষা। আজ যে সব আতঙ্ক আমাদের তাড়া করছে, সে জন্য পালাতে রাজী নই আমি। হিন্দুদের যদি আত্মবিশ্বাস থাকত, স্বীয় ঐতিহ্য অনুযায়ী কাজ করত, তাহলে উৎপীড়নের ভয় থাকার কারণ থাকত না। যখনি তারা আবার প্রকৃত আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ শুরু করবে, মুসলমানরা সাড়া দেবে। না দিয়ে পারবে না। নিজেতে, এবং সে কারণে মুসলমানেও বিশ্বাস রাখে, এমন একদল তরুণ হিন্দু যদি পাই, সে দলটি দুর্বলদের রক্ষা করবে। সেই (তরুণ হিন্দুরা) শেখাবে কেমন করে না মেরেও মরা যায়। আমি অন্য কোন পন্থা জানি না। চারদিকে দুঃসময় ঘণিয়ে আসছে দেখলে আমাদের পূর্বপুরুষরা তপস্যা-শুদ্ধির সহায়তা নিতেন। শরীর কত অসহায় তা তাঁরা জানতেন। নিজেদের অসহায় অবস্থায় তাঁরা প্রার্থনা করতেন। স্রষ্টাকে বাধ্য করতেন তাঁদের আবেদন মানতে। আমার হিন্দু বন্ধু বলেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ! তবে ঈশ্বর তো কাউকে পাঠাতেন সশস্ত্র যুদ্ধ করতে।' এ প্রত্যুত্তরের সত্যতা অস্বীকার করতে আমি আগ্রহী নই। বন্ধুকে এটুকুই বলতে পারি, তিনি কাজটা আদায় করুন। তবে কারণটা যেন উপেক্ষা না করেন। যখন যথেষ্ট তপস্যা করব, তখন লড়াই করার সময় হবে। আমরা কি যথেষ্ট শুদ্ধ? এ কথা শুধাই। ব্যক্তির ব্যক্তিগত শুদ্ধতার কথা থাক, অস্পৃশ্যতার পাপের জন্য আমরা কি স্বেচ্ছায় যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত করেছি? তাঁদের যেমনটি হওয়া উচিত, আমাদের ধর্মীয় নেতারা কি তাই? মুসলমানদের আচরণে ছিদ্র অন্বেষণ করার কাজে সমগ্র মনোযোগ দিয়ে আমরা শূন্যে হাতড়াচ্ছি।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, 19 জুন 1924
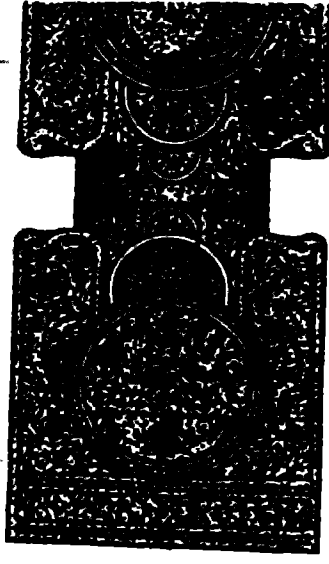
11

হিন্দুধর্মের স্থিতি

হিন্দুরা এক প্রাণময় সত্তা। তার বৃদ্ধি ও ক্ষয় আছে। তা প্রকৃতির নিয়মের বশীভূত। মূলে তা ছিল এক এবং অবিভাজ্য, কালে তা এক বিশাল মহীরুহ, অসংখ্য ডালপালা তার। ঋতুর পরিবর্তন তাকে প্রভাবিত করে। তার শরৎ, গ্রীষ্ম, শীত ও বসন্ত আছে। বৃষ্টি তাকে পুষ্টি যোগায়, তাকে ফলন্ত করে। ধর্মগ্রন্থে এর ভিত্তি আছে, আবার নেইও। কোন একটি গ্রন্থ থেকে এ পথনির্দেশ নেয় নি। গীতা সর্বজনীন স্বীকৃতি পেয়েছে। তবু, তা পথ দেখায় মাত্র। আচরিত প্রথার উপর এর কোন প্রভাব নেই। গঙ্গার মতই, হিন্দুত্ব উৎসে শুদ্ধ ও দূষণহীন। তবে প্রবাহপথে সে বয়ে নিয়ে চলে অনেক দূষণ। গঙ্গার মতই এর সমগ্র প্রভাবটি উপকারী। প্রতি প্রদেশে এ সেখানকার প্রাদেশিক রূপ নেয়। তবে সর্বত্র অটুট থাকে এর আন্তরশক্তি। আচরণ বা প্রথা ধর্ম নয়। প্রথা বদলায়, কিন্তু ধর্ম বদলাবে না।

এর প্রবক্তাদের আত্মসংযমের ওপরেই হিন্দুত্বের শুদ্ধতা নির্ভর করে। যখনি ধর্ম বিপন্ন হয়েছে, হিন্দুরা কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করেছে, বিপদের কারণ অনুসন্ধান করেছে। তার সঙ্গে লড়বার উপায় উদ্‌ভাবন করেছে। শাস্ত্রগুলি বেড়েই চলেছে। বেদ, উপনিষদ, স্মৃতি, পুরাণ ও ইতিহাস-এর সূচনা একই সময়ে হয়নি। বিশেষ সময়ের প্রয়োজন থেকে একেকটির উদ্ভব। তাই মনে হয়, এদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। এ সব গ্রন্থ চিরন্তনী সত্যকে নতুন করে ঘোষণা করে

না। তবে যে যুগে রচিত, সে সময়ে এ সব প্রথা কি ভাবে আচরিত হত, তা জানিয়ে দেয়। এক বিশেষ যুগের পক্ষে এক আচরণবিধি হয়তো উপযোগী ছিল। অন্য যুগে তার অন্ধ পুনরাবৃত্তি মানুষকে হতাশার পঙ্কে নিমজ্জিত করবে। এক সময়ে পশুবলি দেওয়া হত। আমরা কি আবার তা ফিরিয়ে আনব? এক সময়ে আমরা চোরদের হাত পা কেটে ফেলতাম। সেই বর্বরতা কি আজ আবার শুরু করব? মেয়েদের বহুস্বামীকে বিবাহ প্রথা, বাল্য-বিবাহ আবার ফিরিয়ে আনব? একদা মানবতার এক অংশকে বর্জন করেছিলাম, আজ তাদের বংশধরদের কি জাতিচ্যুত বলব?

হিন্দুত্ব বদ্ধাবস্থাকে ঘৃণা করে। জ্ঞান সীমাহীন, সত্যের প্রয়োগও সীমাহীন। আত্মার শক্তিকে প্রত্যহ যোগ করি আমাদের জ্ঞানের সঙ্গে। এ কাজ আমরা করে চলব। নতুন অভিজ্ঞতা আমাদের শেখাবে নতুন কর্তব্য। তবে সত্য চিরকাল অপরিবর্তিত থাকবে। বেদ সত্যকে প্রতিভাত করে, বেদ সীমাহীন। কিন্তু বেদকে সম্পূর্ণ জানে কে? আজ বেদ নামে যা চলে, তা সেই জ্ঞান ভাণ্ডার, সেই প্রকৃত বেদের এক অণু অংশও নয়। যে কয়টি গ্রন্থ আছে, তার সম্পূর্ণ অর্থ জানে কে? এমন সব অন্তহীন জটিলতার মধ্য দিয়ে চলার চেয়ে অনেক ভাল শিক্ষা দিয়েছেন জ্ঞানীরা। একটি জিনিসই শিখতে বলেছেন, 'আত্ম বিষয়ে যেমন, বিশ্ব বিষয়েও তেমন।' বিশ্বকে তো পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ সম্ভব নয়, আত্ম বিশ্লেষণ সম্ভব। নিজেকে জানো, বিশ্বকে জানতে পারবে। তবু অন্তরস্থিত আত্মজ্ঞান মানে আগেই মেনে নেওয়া যে, অক্লান্ত চেষ্টা চালাতে হবে। শুধু অক্লান্তই নয়, তাকে শুদ্ধও হতে হবে। শুদ্ধ পরিশ্রম মানে এক শুদ্ধ হৃদয়, —যা ইয়ম* এবং নিয়মের অভ্যাসের ওপর নির্ভরশীল। যাকে বলা চলে চারটি গুণ, এবং অভাবিতপূর্ব গুণের সমন্বয়।

ঈশ্বরের করুণা মানেই বিশ্বাস ও ভক্তি, আর তাঁর করুণা ব্যতীত এ অনুশীলন সম্ভব নয়। তাই তুলসীদাস রামনামের মহিমা গেয়েছেন, ভাগবতের গ্রন্থকার শিখিয়েছেন দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র (ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়)। এ মন্ত্র যিনি অন্তর থেকে উচ্চারণ করতে পারেন, আমার মতে তিনি এক সনাতনী হিন্দু। আর সবই

* ইয়ম, যোগশাস্ত্র মতে শ্রেষ্ঠ গুণ হল, অহিংসা, (হিংসা নয়), সত্য, অস্তেয় (চুরি না করা), ব্রহ্মচর্য (চিরকৌমার্য), অপরিগ্রহ (সম্পত্তি না-থাকা), নিয়ম, অথবা গৌণ গুণ হল যোগশাস্ত্র মতে শৌচ (দেহের শুচিতা), সন্তোষ (সর্বাবস্থায় তৃপ্তি), তপ (তপস্যা), স্বধ্যায়ন (ধর্মগ্রন্থ অনুশীলন), ঈশ্বরপ্রণিধান (ঈশ্বরেচ্ছায় কাছে আত্মসমর্পণ)। — এম. ডি

এক অতলান্ত খাদ, জ্ঞানী আখো** যেমন বলেছেন।

ইউরোপীয়রা আমাদের আচরণ ও প্রথা চর্চা করে। তবে সে তো ভক্তজনের চর্চা নয়, সমালোচকের চর্চা। তাদের 'চর্চা' আমাকে ধর্ম শেখাতে পারে না। হিন্দুত্ব মানে আহারে বাছবিচার নয়। ন্যায্য আচরণ, সত্যের সঠিক অনুধাবণ এবং অহিংসা হল হিন্দুত্বের সারনির্যাস। অনেক মানুষ হয়তো মাংসাহারী। কিন্তু তার আছে ঈশ্বরভীতি, সহানুভূতি ও সত্য—এ সব শ্রেষ্ঠ গুণ সে মেনে চলে। যে কপট ব্যক্তি মাংস খায় না, তার চেয়ে হিন্দু হিসেবে এ ভালো। যে গোমাংস বা অন্য মাংস ভক্ষণের মধ্যে সত্যই যে হিংসা আছে, সে বিষয়ে অবহিত, এবং সে জন্য আমিষ ত্যাগ করেছে, —যে 'মানুষ, পশু ও পাখিকে' ভালবাসে, সে আমাদের পূজা পাবার যোগ্য। সে ঈশ্বরকে দেখেছে, জেনেছে। সে তাঁর শ্রেষ্ঠ উপাসক। সে মানবতার শিক্ষক।

হিন্দুত্ব এবং অন্য সকল ধর্ম তুলাদণ্ডে ওজন করা হচ্ছে। চিরন্তন সত্য এক। ঈশ্বরও এক। এসো, আমরা সবাই পরস্পরবিরোধী ধর্মমত ও প্রথা থেকে দূরে থাকি। সত্যের সিধা পথে চলি। একমাত্র তখনি আমরা প্রকৃত হিন্দু হব। অনেকে আছে, যারা নিজেদের বলছে সনাতনী। ঈশ্বর তাদের কত সামান্য ক'জনকে বেছে নেবেন, তা কে জানে? যারা তাঁর ইচ্ছানুযায়ী কাজ করে, তাঁর দ্বারে অপেক্ষায় থাকে, ঈশ্বরের করুণা বর্ষিত হবে তাদের ওপর। যারা শুধু মুখে 'রাম রাম' বলে, তাদের ওপর নয়।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, 8 এপ্রিল 1926

** আখো : গুজরাটের এক সত্যদ্রষ্টা কবি।

12

অস্পৃশ্যতারূপী রাবণ

পুরাণে কথিত গল্পগুলির কয়েকটি যে অতীব বিপজ্জনক তা বোঝা যাবে বর্তমান পরিস্থিতিতে তাদের তাৎপর্য বিচার করলে। তাতে যা বর্ণিত হয়েছে তার প্রতিটি খুঁটিনাটি যদি মেনে চলি আচরণে, বর্ণিত চরিত্রের অনুরূপ আচরণ যদি করি—শাস্ত্রগুলি তা হলে মরণ-ফাঁদ হয়ে দাঁড়াবে। মূলনীতিগুলির সংজ্ঞানিরূপণে ও যুক্তিপূর্ণ আলোচনায় তারা সহায়তা করে মাত্র। ধর্মপুস্তকের কোন পরিচিত চরিত্র যদি ঈশ্বর বা মানুষের বিরুদ্ধে পাপ করে থাকেন, সেটাকে কি সতর্কবাণী হিসেবে ধরব? যাতে সে পাপ আবার আমরা না করি? পৃথিবীতে সত্যই পরমবস্তু, সত্যই ঈশ্বর, এ তো আমাদের একবার বলে দেওয়াই যথেষ্ট। যুধিষ্ঠিরও যে মিথ্যা বলতে বাধ্য হয়েছিলেন, সে কথা আবার বলা অপ্রাসঙ্গিক। এর চেয়ে আমাদের এ কথা জানা অনেক প্রাসঙ্গিক যে, যখনি তিনি মিথ্যা কথাটি বললেন, সেই মুহূর্ত থেকেই তাঁর যন্ত্রণা শুরু হল, এবং অমন নামী মানুষ হয়েও শাস্তি এড়াতে পারেন নি। তেমনি ভাবেই, আদিশঙ্কর যে এক চণ্ডালকে এড়িয়ে গিয়েছিলেন, এ কথা আমাদের বলা অপ্রাসঙ্গিক। একটি ধর্ম আমাদের বলে, আত্মবৎ ব্যবহার করবে সকল জীবের সঙ্গে—একটি মাত্র প্রাণী কেন, সম্পূর্ণ নিষ্পাপ এক মানবগোষ্ঠীর সঙ্গে অমানবিক আচরণ সে ধর্ম কিছুতে বরদাস্ত করতে পারে না—এটুকু জানলেই আমাদের যথেষ্ট হবে। তা ছাড়া, আদিশঙ্কর কি করেছিলেন. না করেছিলেন, সে বিষয়ে সব তথ্যও তো হাতে নেই যে বিচার

করব আমরা। যেখানে চণ্ডাল শব্দটি দেখা গেল, শব্দটির যথার্থ মানেই কি জানি? এ শব্দের অনেক মানে, একটি হল পাপী। যদি সব পাপীকেই অস্পৃশ্য বলতে হয়, তাহলে আশঙ্কা আছে, ওই পণ্ডিত* সহ আমাদের সকলকেই অস্পৃশ্যতা দোষে দোষী হতে হয়। অস্পৃশ্যতা এক প্রাচীন ব্যাপার, তা কেউ অস্বীকার করছে না। তবে ধারণাটি যদি কলঙ্কজনক হয়, প্রাচীনত্বের কারণে তাকে সমর্থন করা চলে না।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, 29 জুলাই 1926

* যে প্রবন্ধ থেকে এই অংশ উদ্ধৃত হল, তা এক আবেদনের উত্তর। দক্ষিণ ভারতের এক পণ্ডিত অস্পৃশ্যতা সমর্থনে আবেদন জানিয়েছিলেন।

13

তুলসীদাস

তুলসী রামায়ণ বিষয়ে আমার দৃষ্টিভঙ্গি সমালোচনা করে অনেক বন্ধু বিভিন্ন সময়ে আমাকে লিখেছেন। তাঁদের সমালোচনার সারসংক্ষেপ এই রকম :

> আপনি রামায়ণকে এক শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলেছেন, কিন্তু আপনার মত আমরা মেনে নিতে পারি নি। আপনি কি দেখতে পান না তুলসীদাস কি ভাবে মেয়েদের হেয় করেছেন, বালিকে হত্যাকালে রামের কাপুরুষ চাতুর্যকে সমর্থন করেছেন, দেশদ্রোহী বিভীষণকে প্রশংসা করেছেন, সীতার প্রতি বর্বর অবিচার সত্ত্বেও রামকে অবতার বলে বর্ণনা করেছেন? এমন এক বইয়ে আপনি কি মাধুর্য খুঁজে পান? কিংবা, আপনি কি ভাবেন যে বইটির কাব্যমাধুরীই সকল কিছুর ক্ষতিপূরণ? তা যদি হয়, তাহলে আমরা বলতে বাধ্য হব যে, যে-দায়িত্ব নিয়েছেন, আপনি তার যোগ্য নন। প্রয়োজনীয় গুণ আপনার নেই।

স্বীকার করছি, সমালোচনার প্রতিটি প্রসঙ্গ এক এক করে ধরলে, তা কাটানো কঠিন, এবং সমগ্র রামায়ণকেই সহজেই ধিক্কার দেওয়া চলে। তবে সে তো প্রতি প্রসঙ্গ, প্রতি মানুষ বিষয়ে বলা চলে। এক বিখ্যাত চিত্রশিল্পী বিষয়ে এক গল্প আছে। সমালোচকদের উত্তর দেবার জন্য, তিনি তাঁর ছবিটিকে একটি দোকানের জানলায় রাখেন। আমন্ত্রিতদের বললেন, ছবির যেখানটা তাঁদের ভাল লাগছে না, সেখানে চিহ্ন দিতে। দেখা গেল, সমালোচকদের হস্তচিহ্ন থেকে ছবির কম অংশই বাদ গেছে। অথচ এটা ঘটনা যে, ছবিটি ছিল এক অত্যুৎকৃষ্ট শিল্পকর্ম। বেদ, বাইবেল এবং কোরাণও ধিক্কার থেকে রেহাই পায়নি। কোন বইকে যথার্থ

মূল্যায়ন করতে হলে তার সমগ্রটা ধরে বিচার করতে হয়। এ তো গেল বাইরের সমালোচনার কথা। বইটির প্রকৃত পরীক্ষা হয় তখন, যখন সন্ধান চালানো হয়, অধিকাংশ পাঠকের মনে এ কি প্রভাব ফেলেছে। যে ভাবেই বিচার করা হোক, এক উৎকৃষ্ট বই হিসেবে রামায়ণের অবস্থান ধরা ছোঁয়ার বাইরে। তার মানে এই নয় যে এতে কোন ক্রুটি নেই। তবে রামায়ণের সপক্ষে এ দাবি করাই যায় যে, বইটি লক্ষ কোটি মানুষকে শান্তি দিয়েছে, যারা বিশ্বাসহীন তাদের দিয়েছে বিশ্বাস যারা বিশ্বাসহীনতায় অগ্নিদগ্ধ, তেমন হাজার হাজার মানুষকে এনে দিয়েছে তাপ কুড়ানোর প্রলেপ। এর প্রতি পাতা ভক্তিরসে প্লাবিত। আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার এ এক অমূল্য খনি বিশেষ।

এ কথা সত্য যে মাঝে মাঝে দুরভিসন্ধি লোকেরা তাদের পাপ আচরণের সমর্থনে মাঝে মাঝে রামায়ণকে ব্যবহার করে। কিন্তু রামায়ণে কোন অশুভ অমঙ্গলের প্রমাণ নেই। আমার মনে হয় উদ্দেশ্যপ্রণোদিত না হয়েও তুলসীদাস নারীত্বের প্রতি অবিচার করেছেন, তা আমি মানি। এ বিষয়ে, অন্যান্য বিষয়েও তিনি তাঁর যুগের ধারণাবলী কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। অন্য ভাবে বলা যায়, তুলসীদাস কোন সংস্কারক ছিলেন না। উপাসকদের মধ্যে তিনি এক শ্রেষ্ঠ উপাসক। রামায়ণের ক্রুটিগুলি তুলসীদাসের মানসিকতার প্রতিচ্ছবির চেয়ে অনেক বেশি প্রতিচ্ছবি তাঁর যুগের মানসিকতার। এমন এক পরিস্থিতিতে, মেয়েদের অবস্থান বা তুলসীদাস বিষয়ে সংস্কারকের দৃষ্টিভঙ্গি কি হওয়া উচিত? তুলসীদাস থেকে তিনি কি কোন সাহায্যই পেতে পারেন না? এর স্পষ্ট উত্তর ঃ 'পারেন।' রামায়ণে মেয়েদের বিষয়ে অবমাননাকর মন্তব্য থাকা সত্ত্বেও, এ কথা ভুললে চলবে না যে, এ গ্রন্থে তুলসীদাস পৃথিবীকে উপহার দিয়েছেন সীতার এক অতুলনীয় আলেখ্য। সীতা না থাকলে রাম কোথায় থাকতেন? রামায়ণে কৌশল্যা, সুমিত্রা আদির অন্যান্য মহনীয় চরিত্রও পাই। শবরী ও অহল্যার বিশ্বাস ও ভক্তির সামনে আমরা শ্রদ্ধায় মাথা নিচু করি। রাবণ এক দানব, কিন্তু মন্দোদরী সতী। আমার মতে, এই দৃষ্টান্তগুলিই প্রমাণ করে যে, স্ববিশ্বাস থেকে তুলসীদাস মেয়েদের হেয়কারী হননি। উলটোটা বলা যায়, নিজের বিশ্বাসের কথা যদি ওঠে, মেয়েদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাই ছিল। নারীদের বিষয়ে তুলসীদাসের দৃষ্টিভঙ্গি বিষয়ে এটুকুই থাকুক।

বালি হত্যা বিষয়ে, দু'রকম মতের স্থান আছে। বিভীষণের মধ্যে আমি তো কোন দোষ দেখি না। বিভীষণ তাঁর দাদার বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করেছিলেন। তাঁর

দৃষ্টান্ত আমাদের এটাই শেখায়, —দেশের শাসক বা দেশের দোষসকল ঢেকে চলা, সে সময়ে সহানুভূতি দেখানো দেশপ্রেমের প্রহসন মাত্র। ও সবের বিরোধিতা করাই প্রকৃত দেশপ্রেম। রামকে সহায়তার মাধ্যমে বিভীষণ স্বদেশের সেবায় শ্রেষ্ঠ কাজ করেন। সীতার প্রতি রামের আচরণে হৃদয়হীনতা নেই। রাজার কর্তব্য ও স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ভালবাসা, এ দুয়ের মধ্যে দ্বন্দ্বের প্রমাণ ওটা।

যে বিশ্বাসহীনদের রামায়ণ প্রসঙ্গে সত্যিই সন্দেহ আছে, আমি বলি তাঁরা যেন অপরের ব্যাখ্যাগুলি যান্ত্রিক ভাবে মেনে না নেন। বইটির যে সব অংশ বিষয়ে তাদের সংশয় আছে, সেগুলি যেন বাদ দিয়ে যান। সত্য ও অহিংসা বিরোধী যা, তা যেন ক্ষমা না পায়। আমাদের মতে রাম প্রবঞ্চনা করেছিলেন, তাই আমরাও তা করতে পারি এ যুক্তি দেখানো বিকৃতির পরিচায়ক। সঠিক কাজটি হবে এই বিশ্বাস করা যে, প্রবঞ্চনা করতে রাম অপারগ। গীতাতে যেমন বলা হয়েছে, 'সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত, এমন কিছু পৃথিবীতে নেই।' কিংবদন্তীর রাজহংস নীর ছেড়ে ক্ষীর গ্রহণ করে। আমরাও যেন তেমনই সর্বক্ষেত্রে ভালোকে সমাদর করতে, এবং মন্দকে পরিহার করতে শিখি। ঈশ্বর ব্যতীত কোন মানুষ বা বস্তু ত্রুটিশূন্য নয়।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, 31 অক্টোবর 1929

14

বেসিল ম্যাথ্যুসের সঙ্গে সংলাপ

মি: বেসিল ম্যাথ্যুস জানতে উৎসুক ছিলেন, গান্ধীজী কোন আধ্যাত্মিক আচার নিয়ম মানেন কিনা, এবং কোন্ বিশেষ অধ্যয়ন তাঁর কাছে সহায়কারী মনে হয়েছে। মহাত্মা গান্ধী ও তাঁর কথোপকথন :

গান্ধীজী : যৌগিক আসন আমার অজানা। শৈশবে ধাত্রীর কাছে যে আচরণবিধি শিখি, তাই অনুশীলন করে চলছি। আমি ভূতে ভয় পেতাম। সে আমাকে বলত, 'ভূত বলে তো কিছু নেই, তবে ভয় পেলে বারবার রামনাম কোর।' শৈশবে যা শিখলাম তা আমার মনের দুনিয়াতে এক বিশাল ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। আমার অন্ধকারতম সময়কেও এ সূর্য আলোকোজ্জ্বল করেছে। কোন খ্রিষ্টান হয়তো যিশুর নাম বারবার বলে, একই সান্ত্বনা পায়, এক মুসলমান তা পায় আল্লার নামে। এ সব কিছুর নিহিত অর্থ একই। একই রকম পরিস্থিতিতে একই পরিণাম দর্শায় এ সব। তবে নামআবৃত্তি যেন ঠোঁটনাড়া না হয়, তোমার অন্তর্সত্তার অঙ্গ হয়ে ওঠে যেন।

কী অধ্যয়নে সাহায্য হয়েছে? আমরা নিয়মিত ভাগবতগীতা পড়ি। এমন এক স্তরে পৌঁছে গেছি যে, প্রতি সকালে নির্দিষ্ট অধ্যায় পাঠ হয়, প্রতি সপ্তাহে সমগ্র গীতা পাঠ করে ফেলি। ভারতের বিভিন্ন সন্তদের স্তোত্র আছে, খ্রিষ্টান স্তোত্র-পুস্তক থেকেও স্তোত্র নিয়েছি, সঙ্গে আছেন খানসাহেব। ফলে কোরাণও পাঠ করা হয়। আমরা সকল ধর্মের সাম্যে বিশ্বাসী। আমি নিজে তুলসীদাসের

রামায়ণ পড়ে সবচেয়ে বেশি সান্ত্বনা পাই। নিউ টেস্টামেন্ট ও কোরাণ পাঠেও আমি সান্ত্বনা পেয়েছি, সমালোচকের মন নিয়ে ও সব বই পড়ি না। ও গুলি আমার কাছে ভাগবদগীতার মতই গুরুত্বপূর্ণ। যদিও ও বইয়ের সব কিছুই আমার মনে সাড়া জাগায় না। সে তো এপিল্স পলও জাগায় না, তুলসীদাসের সব কিছুও নয়। গীতা এক বিশুদ্ধ নিরম্বর ধর্মোপদেশ। যে আত্মা তীর্থযাত্রী, তার পরম লক্ষ্যে পৌঁছবার পথের বর্ণনা মাত্র। তাই, (বই) নির্বাচনের কোন প্রশ্নই ওঠে না।

মিঃ ম্যাথ্যুস : আপিনি আসলে প্রটেস্টান্ট।

গান্ধীজী : জানি না আমি কি, কি নই। মিঃ হক আমাকে প্রেসবিটেরিয়ান বলতেন।

মিঃ ম্যাথ্যুস : সত্যের চূড়ান্ত প্রমাণ আপনি কোথা থেকে পান?

গান্ধীজী : (বুকের দিকে আঙুল তুলে) এখানে। সকল ধর্মগ্রন্থ, এমন কি গীতার ক্ষেত্রেও আমি আমার বিবেক প্রয়োগ করি। কোন ধর্মগ্রন্থকে আমার যুক্তিবিচার ছাপিয়ে যেতে দিই না। মানি যে, শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ ঈশ্বর প্রেরিত। আবার এটাও জানি যে দু'বার রূপান্তরিত হয়ে এসেছে ওগুলি। প্রথমত, কোন মহাপুরুষের মাধ্যমে, তারপর ভাষ্যকারদের ব্যাখ্যার মাধ্যমে। ঈশ্বরের কাছ থেকে সরাসরি তো আসে না। একটি গ্রন্থের এক ভাষ্য দিলেন ম্যাথিউ, জন হয়তো অন্য ভাষ্য দেবেন। আমি দিব্যজ্ঞানে বিশ্বাস রাখি, তবু নিজ বিবেককে জলাঞ্জলি দিতে পারি না। সর্বোপরি, 'শব্দ হন্তারক, নিহিতার্থ জীবনদাতা।' তবে আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমার এমন জিনিসেও বিশ্বাস আছে, যেখানে তর্কের কোন জায়গা নেই। যেমন, ঈশ্বরের অস্তিত্ব। কোন তর্কই আমাকে সে বিশ্বাস থেকে টলাতে পারবে না। সেই শিশুটির মতো, যে সকল যুক্তির পরেও বলে, 'কিন্তু আমরা তো সাতজন!' কোন অধিক বুদ্ধিমান ব্যক্তির কাছে তর্কে হেরে যাওয়ার পরেও আমি বারবার বলতে চাই, 'কিন্তু ঈশ্বর আছেন।'

হরিজন, 5 ডিসেম্বর 1936

15

এম. সি. রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎকার

বিশুদ্ধতম হিন্দুধর্মের দৃষ্টিতে ব্রাহ্মণ, পিপীলিকা, হাতি ও শ্বপচ (কুকুরের মাংসভোজী)-এর সমান মর্যাদা। আমাদের দর্শন এমন উচ্চমার্গীয় বলেই আমরা তা ধরতে ছুঁতে পারি নি। আর ওই দর্শনই আমাদের নাক থেকে দুর্গন্ধ নিশ্বাস ছড়াচ্ছে। শুধু মানবজাতি নয়, সকল প্রাণীর সঙ্গে সৌভ্রাত্রের কথা বলে হিন্দুধর্ম। এ আদর্শের কথা ভাবলে মাথা ঘুরে যায়, কিন্তু আমাদের ওই স্তরে উঠতেই হবে। মানুষে মানুষে এক বাস্তব, জীবন্ত সাম্য গড়লে আমরা মানুষ আর সমগ্র বিশ্বের মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হব। যখন সেদিন আসবে, পৃথিবীতে শান্তি ও পারস্পরিক মানবীয় সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হবে।

হরিজন, 28 মার্চ 1936

16

কুইলনে ভাষণ

এখন এ কথা ভাবা যাক, হিন্দুধর্মের মর্ম কী। অনেক সন্ত ও মহাত্মা, ইতিহাসে যাঁদের উল্লেখ আছে, তাঁদের প্রেরণা যোগাল, কি সে বস্তু? এ ধর্ম সংসারকে এত দার্শনিক যোগাল, তার কারণ কি? কি আছে এতে যাতে এর উপাসকরা বহু শতাব্দী ধরে প্রেরণা পাচ্ছেন? অস্পৃশ্যতাবিরোধী সংগ্রামের কারণে অনেক কর্মী আমার কাছে হিন্দুধর্মের সারতত্ত্ব জানতে চেয়েছেন। ওঁরা বলছেন, আমাদের কাছে তো ইসলামের মতো কোন 'কলমা' নেই। বাইবেলে সন্তজন 3–16-এ যেমন খ্রিষ্টান ধর্মের মূল মর্ম উল্লেখ করেছেন, তাও নেই। আমাদের কাছে কি এমন কিছু নেই যা দার্শনিক এবং বাস্তববাদী, দুইরকম হিন্দুকেই সন্তুষ্ট করতে পারে? কিছু লোক বলেন, গায়ত্রী মন্ত্র তো আছে—এ কথা অমূলকও নয়। আমি গায়ত্রী মন্ত্রের অর্থ বুঝে, হাজার বার তা জপ করেছি। তবু এখনো মনে হয়, ওই মন্ত্র আমার আধ্যাত্মিক পিপাসা তৃপ্ত করতে পারে নি। আপনারা জানেন, বহু বছর ধরে আমি ভাগবদগীতার ভক্ত। আমার সকল সমস্যার সমাধান এ থেকে মেলে। শঙ্কার, সমস্যার, শত শত প্রসঙ্গে এ গ্রন্থ আমার কাছে কামধেনু স্বরূপ। পথ দেখায়, সহায়তা করে। এ আমি আগেও বলেছি। কোন প্রসঙ্গ মনে পড়ে না যখন আমাকে এ গ্রন্থ নিরাশ করেছে। তবু এ সেই বই নয়, যাকে আমি উপস্থিত সকল শ্রোতার অনুমোদন পাবে আশায় রাখতে পারি। প্রার্থনাবিনম্র মনে এ বই গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে তবেই আত্মার জন্য এর পয়োধরে যে

অমৃত সঞ্চিত আছে, তা আমরা পেতে পারি।

তবে অবশ্যই আছে এক মন্ত্র, যাকে আমি হিন্দুধর্মের সারাৎসার বলে মানি। সে মন্ত্র আপনাদের শোনাচ্ছি। আমার ধারণা, আপনাদের অনেকেই ঈশোপনিষদ-এর কথা জানেন। বহুকাল আগে আমি এর টীকা সম্বলিত অনুবাদ পড়ি। যারবেদা জেলে আমি এটি কণ্ঠস্থ করি। তবে বিগত কয়েক মাস ধরে যেমন আছি, তখন আমি এ বই বিষয়ে তত মুগ্ধ ছিলাম না। কিন্তু এখন আমি এই শেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, সহসা যদি অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ সহ সকল উপনিষদ ধ্বংস হয়ে যায়, ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোকটি হিন্দুদের মনে থাকলে হিন্দুধর্ম চিরজীবী হবে।

এ মন্ত্রের চার অংশ। প্রথম অংশ, ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যত্কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। আমি এই অর্থ করেছি এর : বিশ্বে আমরা যা কিছু দেখছি, সব কিছুতে ঈশ্বরের সত্তা ব্যাপ্ত। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশ এইরূপ : তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জিথা:। একে দুই ভাগে ভাগ করে আমি এ ভাবে অনুবাদ করছি : একে ত্যাগ করো আর একে যোগ করো। এর আরেকটি অনুবাদও আছে, যদিও তার অর্থ প্রায় এর অনুরূপ। সেই অনুবাদটি এই: তিনি তোমাকে যা কিছু দেন, তা ভোগ করো। এই অনুবাদকেও দুটি অংশে ভাগ করা চলে। এর পরে আসছে এর শেষ এবং সবচেয়ে মহান অংশ: মা গৃধঃ কস্যদ্বিজনম্। এর অর্থ, কারো সম্পত্তি লুব্ধ চোখে দেখো না। এই প্রাচীন উপনিষদের বাকি সকল মন্ত্রই প্রথমটির ভাষ্য। সেগুলিতে ওটির সম্যক অর্থ উদঘাটনের প্রয়াস আছে। যখন এ মন্ত্রকে গীতার আলোকে রেখে, বা গীতাকে এই মন্ত্রের আলোকে রেখে পড়ি, মনে হয় গীতা যেন এ মন্ত্রেরই ভাষ্য। আমার মনে হয়, সমাজবাদী বা সাম্যবাদী, দার্শনিক বা অর্থনীতিক এ মন্ত্র সকলকে সমাধান এনে দেয়। যাঁরা হিন্দুধর্ম অনুসারী নন, ধৃষ্টতাভরেই তাঁদের বলছি, এ মন্ত্র সকলেরই সকল প্রশ্নের উত্তর। আর এ কথা অন্তত আমার কাছে সত্য—যা এই মন্ত্রের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ, এর বিরোধী, হিন্দুধর্মে তেমন কোন কিছু থাকলে তাকে মহত্বপূর্ণ মনে করা নিষ্প্রয়োজন। ঈশ্বর এক, সকল জীবের স্রষ্টা ও নিয়ন্তা এক, তিনি বিশ্বের কোণে কোণে ব্যাপ্ত। কোন সাধারণ মানুষ এর চেয়ে বেশি কি জানতে চাইবে! এ মন্ত্রের তিন অংশ সরাসরি প্রথম অংশের মধ্যেই প্রতিফলিত। আপনারা যদি এ কথা মানেন যে, ঈশ্বর সমগ্র সৃষ্টিতে ব্যাপ্ত, তবে আপনাদের এ কথাও মানতে হবে, যা তিনি দেন নি, তেমন বস্তু উপভোগ আপনারা করতে পারেন না। তিনি জানেন, তিনি অসংখ্য সন্তানের

স্রষ্টা। তাহলে এ তো স্পষ্ট যে, অপরের সম্পদ লোভের দৃষ্টিতে দেখতে পারেন না আপনি। যখন বোঝেন তাঁর সৃষ্ট অসংখ্য প্রাণীর মধ্যে আপনিও একজন, তখন সব ত্যাগ করে তাঁর চরণে তা অর্পণ করা আপনার ধর্ম হয়ে দাঁড়ায়। এই ত্যাগ, কোনো স্থূল ত্যাগ নয়—দ্বিতীয় এক নবজন্মের প্রতীক। অজ্ঞানজনিত কাজ নয় এ। বিচারপূর্বক কৃত কাজ এটি। তাই এ এক নবজন্ম। মনুষ্যদেহধারীর অন্ন-জল-বস্ত্র চাই। সে জন্য যা যা দরকার হয়, মানুষ ঈশ্বরের কাছেই চায়। ত্যাগকার্যের স্বাভাবিক পুরস্কার হিসেবেই সে সব মানুষ পেয়ে যায়। হয়তো এও যথেষ্ট নয়। তাই মন্ত্রের শেষে আছে এক উপদেশঃ অপরের সম্পদকে লোভের চোখে দেখো না। এই শিক্ষাকে জীবনে বাস্তবায়িত করলে আপনি পৃথিবীর সকল প্রাণীর সঙ্গে শান্তি ও সৌহার্দ্রে বসবাসকারী এক সমঝদার বিশ্বনাগরিক হয়ে ওঠেন। মানুষের ঐহিক বা পারলৌকিক, উচ্চতম আকাঙ্খার তৃপ্তি এতেই।

হরিজন, 30 জানুয়ারি 1937

17

ভাষণ : হরিপাদে

গত রাতে কুইলনের সভায় আমি হিন্দুধর্মের বার্তার আলোচনা করি। এখন সে বিষয়েই কিছু বলার জন্য আপনাদের কাছে কিছু সময় চাই। সে সভায় এ কথা বলার ধৃষ্টতা করি যে, "ঈশোপনিষদের প্রথম মন্ত্রে সম্পূর্ণ হিন্দুধর্মের সার নিহিত আছে।

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যত্কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জিথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্।

সামান্য সংস্কৃত জানা লোকও দেখবেন, এ অন্য বৈদিক মন্ত্রের মতো দুর্বোধ্য নয়। এর সিধাসাদা অর্থ এই: বিশ্বে ছোট-বড় যা কিছু আছে, তাতে, —এমন কি ক্ষুদাবিক্ষুদ্র অণুতেও, ঈশ্বরের সত্তা ব্যাপ্ত, —যাঁকে আমরা স্রষ্টা, বা প্রভু বলে জানি। এর মানে, যিনি শাস্তা ও স্রষ্টা, স্বভাবতই তিনি শাস্তা হয়ে ওঠেন। এ শ্লোকের রচয়িতা ঋষি, ঈশ্বর বোঝাতে শাস্তার বাইরে বাড়তি কোন শব্দ প্রয়োগ করেন নি। বস্তুজগতে কোন বস্তুকেই তাঁর শাসন পরিধির বাইরে রাখেন নি। ঋষির বক্তব্য, আমরা যা কিছু দেখি, সর্বত্র ঈশ্বর ব্যাপ্ত আছেন। এ টুকু জানলে স্বভাবতই মন্ত্রের শেষ ভাগ স্বচ্ছ হয়ে ওঠে। তিনি বলছেন, সব কিছু ত্যাগ করো। এই ক্ষুদ্র পৃথিবীতে যা কিছু আছে, শুধু তাই নয়, —অখিল ব্রহ্মাণ্ডে যা আছে, সব ত্যাগ করো। আমাদের সব ত্যাগ করতে বলছেন এ জন্য যে, বাস্তবে

আমরা পরমাণুর সমান তুচ্ছ। যদি কোন বস্তু হস্তগত করার কথা চিন্তা করি, তা হাস্যাস্পদ হবে। এরপর ঋষি বলছেন, এ ত্যাগের পুরস্কার ভুঞ্জিথাঃ, অর্থাৎ তোমার যা দরকার, তা উপভোগ করো। ভুঞ্জিথাঃ শব্দের এক বিশেষার্থও আছে। আপনি একে খাদ্য, উপযোগ, এ সবও বলতে পারেন। এর বিশেষ অর্থ হল, আপনার প্রতিপালনের জন্য যেটুকু দরকার, তার বাইরে কিছু নেবেন না। এই জন্য এই উপভোগ বা উপযোগ দুটি মর্যাদা পেয়েছে। এক তো হল ত্যাগ, যা ভাগবতের শব্দে বললে বলতে হয় কৃষ্ণস্পণমস্তু সর্বম। ভাগবত ধর্মের নির্দেশে প্রতিদিন প্রাতঃকালে নিজের সকল বিচার—শব্দ ও কর্ম (মনসা, বাচা, কর্মণা) ঈশ্বরকে অর্পণ করতে আদেশ দেওয়া হয়েছে। কোনদিন যদি ওই অর্পণ না করা হয়, যতক্ষণ করছ না, ততক্ষণ কোন বস্তু স্পর্শ করা, এমন কি সামান্য জল খাওয়ারও অধিকার নেই। যখন ওই ত্যাগ ও অর্পণের কাজ করলে, তার পুরস্কার কি পাচ্ছ? যা যা তোমার অত্যাবশ্যক, আহার-তৃষ্ণা নিবারণ বস্ত্র ও বাসগৃহ, এ সব ভোগের অধিকার পেলে। আপনারা এ কথার ব্যাখ্যা যেমন চান, করুন। উপভোগ ও উপযোগই ত্যাগের পুরস্কার, অথবা ত্যাগই উপযোগের শর্ত। এ তথ্য অকাট্য থেকে যাচ্ছে আমাদের অস্তিত্ব ও আত্মার জন্যই ত্যাগের আবশ্যকতা অনিবার্যরূপেই আছে। এ মন্ত্রের অন্তর্নিহিত শর্ত যদি যথেষ্ট না হয়, ঋষি তো সঙ্গে সঙ্গেই বলছেন 'কারো সম্পত্তিকে লোভের দৃষ্টিও দেখো না।' আমি তো আপনাদের বলব, সংসারের সকল ধর্ম ও দর্শন এ মন্ত্রে বিধৃত। যা ধর্মাবিরুদ্ধ, তা এ মন্ত্রে বর্জিত। ধর্মগ্রন্থের ব্যাখ্যা অনুসারে যা শ্রুতির বিরোধী, তা সর্বদা পরিত্যাজ্য। আর ঈশোপনিষদ তো এক শ্রুতিই বটে।

এই মন্ত্র মনে রেখে আমি এখন ভাবতে বলি, সরকারী ঘোষণার নির্দেশ অনুযায়ী আমাদের অবস্থা কি দাঁড়িয়েছে। কারণ, ব্রহ্মাণ্ডে সর্বত্র যদি ঈশ্বর বিরাজিত থাকেন; যদি ব্রাহ্মণ ও ভাঙ্গী, পণ্ডিত ও মেথর, হলোরা ও পারিয়া সকলের মধ্যেই তিনি বিরাজিত, —তবে এ মন্ত্রের দৃষ্টি অনুযায়ী সকলেই একই স্রষ্টার সৃষ্টি, —উঁচু নেই, নীচু নেই, সবাই সমান। এই ধর্ম ও দর্শন এমন কোন দুর্বোধ্য ব্যাপার নয়, যা শুধু ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় পালন করবে। এতে উদঘাটিত হচ্ছে এক সনাতন সত্য। তাকে সবাই মর্যাদা দিতে পারে। তাই ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা বা মহারানী, অন্য কোন ব্যক্তি থেকে কিছুমাত্র উচ্চজাতি নন। আমরা সবাই ঈশ্বরের সন্তান, তাঁর সেবক মাত্র। মহারাজা যদি তাঁরই সমান অন্যলোকদের মধ্যে প্রথম হন, (বাস্তবে তো তাই আছেন), —সেটা রাজত্ব থাকার কারণে নয়,

—ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ সেবক হওয়ার কারণে। এ তো অতি চমৎকার ও অত্যুত্তম কথা যে, ত্রিবাঙ্কুরের প্রতিটি মহারাজা নিজেকে 'পদ্মনাভদাস' বলেন। উপাধিটি গৌরবপূর্ণ। যিনি দিয়েছিলেন, তাঁকেও অভিনন্দন জানাতে হয়। তাই যখন বললাম, মহারাজা বা মহারানী অন্যদের চেয়ে তিলমাত্র উপরের লোক নন, তখন তো ওঁরা, যে সত্যকে মেনে নিয়েছেন, তাকেই প্রকাশ করলাম। এ কথাও সত্যি, কোন ব্যক্তি নিজেকে অন্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করার ধৃষ্টতা দেখায় কি করে? এ কথাও বলব, এ মন্ত্র যদি যথার্থ হয়, —তথাকথিত উচ্চবর্ণের নয়, এমন কোন মানুষ প্রবেশ করলে মন্দির অপবিত্র হয়, এমন যে ভাববে, তাকে আমি মহাপাপী বলে ঘোষণা করি। সত্যি বলছি, এ ঘোষণা দ্বারা মন্দিরের কলঙ্ক ধুয়ে গেল, তা পবিত্র হল।

এ মন্ত্রেই যদি হিন্দুধর্মের সারাৎসার থাকে, তবে চাইব, সকল নরনারীশিশু এ মন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করুক নিজ হৃদয় মন্দিরে। এ মন্ত্রকে প্রতি মন্দিরের প্রবেশ দরজার উপর উৎকীর্ণ করে রাখা উচিত। আপনারা বোঝেন না, এ মন্ত্র মিথ্যা হয়ে যাবে যদি কাউকে মন্দিরে প্রবেশ করতে না দেন। যদি নিজেকে এই মহতী ও উদার ঘোষণার যোগ্য বলে প্রতিপন্ন করতে চান, —নিজের কাছে ইমানদার থাকতে চান, —স্বীয় ভাগ্যনির্মাতার প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে চান, —এই মন্ত্রের শব্দ ও মর্মকে বাস্তবরূপ দিন। আমার কাছে এ এক মহান কাজ। এতে নাস্তিকের হৃদয় থেকে নাস্তিকতা দূর হয়ে যাওয়া উচিত। হিন্দু বা যে কোন ধর্মের অন্তরসত্যকে যারা শঙ্কার চোখে দেখে, তাদের শঙ্কা কেটে যাওয়া দরকার। এ মন্ত্র সঠিক বুঝলে তথাকথিত নাস্তিকদের অজ্ঞানজনিত নাস্তিকতা চলে যাবে। ত্রিবাঙ্কুরের মন্দিরকে বলেছিলাম, এ ঈশ্বরের ধাম নয়। কিন্তু এই মন্ত্র ঘোষণার লগ্নক্ষণ থেকে এ মন্দির ঈশ্বরের আবাস হয়ে গেছে। কেননা যাদের অস্পৃশ্য মনে করা হ'ত, তাদের মন্দির প্রবেশে আর বাধা নেই। আমার আশা, ইশ্বরের কাছে আমার প্রার্থনা, ত্রিবাঙ্কুরে এমন একটি পুরুষ বা নারীকে যেন না দেখি, অস্পৃশ্যদের জন্য দুয়ার খুলে গেছে বলে যারা এ মন্দির বর্জন করেছে।

হরিজন, 30 জানুয়ারি 1937

18

কোট্টায়ামে সর্বজনিক জনসভায় ভাষণ

আমি হিন্দুধর্মের সার বুঝি, তা বোঝাবার চেষ্টা করেছি। তাই সকলের সামনে ঈশোপনিষদের এক সাদাসিধা মন্ত্র নিবেদন করেছি। আপনারা জানেন, উপনিষদকে বেদের মতই পবিত্র মনে করা হয়। ঈশোপনিষদ, উপনিষদগুলির একটি। ঈশোপনিষদের প্রথম মন্ত্রের অর্থ: এই বিশ্বের কোণে কোণে ঈশ্বর ব্যাপ্ত। এ মন্ত্রে ঈশ্বরকে স্রষ্টা, ঈশ আর বিশ্বের অধিষ্ঠাতা বলা হয়েছে। এ মন্ত্র রচয়িতা দ্রষ্টা ঋষি শুধু এ টুকু বলেই ক্ষান্ত হননি যে, ঈশ্বর বিশ্বের কোণে কোণে ব্যাপ্ত। তার পরে বলেছেন, 'ঈশ্বর সর্বব্যাপী। তাই কোন বস্তুতে তোমার অধিকার নেই, এমন কি নিজের দেহের উপরেও। তোমার যা কিছু আছে, তাতে তাঁর অকাট্য অধিকার।' তাই যে নিজেকে হিন্দু বলে, তার দ্বিজত্ব, যে নিজেকে খ্রিষ্টান বলে, তার নবজন্ম, —এ সব পেতে হলে যা কিছু অজ্ঞতাবশে নিজের মনে করেছ, তা ঈশ্বরকে অর্পণ করতে হবে, সব ত্যাগ করতে হবে। ত্যাগ ও ঈশ্বরে অর্পণ করার পর এ কাজের পুরস্কার স্বরূপ ঈশ্বর পূর্ণ মনোযোগে দেখবেন তোমার আবশ্যকীয় অন্ন-বস্ত্র-আশ্রয় ইত্যাদি যেন মেলে। তাই, জীবনে আবশ্যকীয় বস্তু ভোগ বা উপযোগ করার শর্তই হল, ওগুলি ত্যাগ করে ঈশ্বরকে দিয়ে দাও। এ কাজ প্রত্যহ করা চাই। নইলে আমরা মায়ামোহের বশে সংসারের সবচেয়ে মুখ্য কথাটি ভুলে যেতে পারি। এ সব বলার পর মন্ত্র দ্রষ্টা ঋষি বলছেন: 'লোভের চোখে অন্যের সম্পত্তি দেখো না।' আমি আপনাদের বলি, এই ছোট্ট মন্ত্রে যে

সত্য সমাহিত আছে, তা প্রতি মানুষের ইহলৌকিক ও পরলৌকিক উচ্চতম আকাঙক্ষাকেও তৃপ্ত করতে সক্ষম। ধর্মগ্রন্থ সমূহে সত্য সন্ধান করতে গিয়ে এমন একটি কথাও পাইনি, যা এই মন্ত্রের কাছে আসার যোগ্য। আমি যে সব ধর্মগ্রন্থ পড়েছি, খুব সামান্যই পড়েছি, তাতে চোখ বোলালে আমার মনে হয়, সকল ধর্মগ্রন্থে যা যা উৎকৃষ্ট, তার উৎস এই মন্ত্র। বিশ্ব মৈত্রী বলতে শুধু মানব নয়, সকল প্রাণীর সঙ্গেও মৈত্রীর কথা ভাবলে, তা এই মন্ত্রেই পেয়ে যাই। যে নামেই ডাকি, প্রভু, জগৎনিয়ন্তা, তাঁর প্রতি অবিচল শ্রদ্ধা চাইলে, এই মন্ত্রেই তা মেলে। ঈশ্বরের কাছে সর্বসমর্পণ, নিজের প্রয়োজন মিটাবার জন্য তাঁর উপর বিশ্বাস রাখার কথা ভাবলে, এ মন্ত্রে তাও পেয়ে যাই। আমার আপনার সবায়ের রোমে রোমে, কোণে কোণে, নিশ্বাসপ্রশ্বাসে ঈশ্বর আছেন। তাই এ থেকেই বিশ্বে সকল জীবের সাম্য ও মৈত্রীর সিদ্ধান্তও পাই। যাঁরা সাম্যবাদী চিন্তা করেন, এ মন্ত্রে তাঁদের আকাঙক্ষাও তৃপ্ত হতে পারে। এ মন্ত্র আমাকে বলে, যা ঈশ্বরের বলে জানো, তা নিজের মনে করে কাছে রাখতে পার না। আমার, এবং এ মন্ত্রে আস্থারক্ষাকারী সকলজনের জীবন যদি ঈশ্বরে পূর্ণ সমর্পিত হতেই হয়, —তাহলে তো এ কথাটাই বেরিয়ে আসে যে, সে-জীবন জীবমাত্রকে সতত সেবা করার কাজে ব্যয়িত হওয়া উচিত।

এ আমার শ্রদ্ধা। নিজেকে যারা হিন্দু বলো, সকলেরই এমন শ্রদ্ধা থাকা উচিত। দুঃসাহসভরে আমি আমার খ্রিষ্টান ও মুসলমান ভাইদের বলব, নিজ নিজ ধর্মগ্রন্থ পড়ে দেখুন, —এরচেয়ে বেশি কিছু নেই সেখানে। আমি চাই, সংসারে সবাই, মুসলমান, বা খ্রিষ্টান, বা যাই হও, ত্রিবাঙ্কুরের লোকদের সাহায্য করো। তারা এ মন্ত্রে নিহিত উচ্চাদর্শকে বাস্তবরূপ দিচ্ছে। আপনাদের কাছে এ কথা লুকাতে চাই না যে, হিন্দুধর্মের নামে যে অনেক অন্ধবিশ্বাস চলে, সে আমি জানি। হিন্দুধর্মের নামে ও সব অন্ধবিশ্বাস বিষয়ে সবই জানি, তাতে গভীর দুঃখও পাই। চোরকে চোর বলতে আমার দ্বিধা হয় না। অস্পৃশ্যতাকে সবচেয়ে বড় অন্ধবিশ্বাস বলতে আমি কখনো কোন ইতস্তত করিনি। তবু, সকল অন্ধবিশ্বাস সত্ত্বেও আমি হিন্দু। কারণ, অন্ধবিশ্বাস হিন্দুধর্মের এক অঙ্গ, এ আমি মানি না। হিন্দুধর্মে ধর্মগ্রন্থের কথা ব্যাখ্যা করার যে নিয়ম আছে, তা থেকেই আমি যা শিখেছি, তা হ'ল, —যে সত্যের প্রতিপাদন আমি এখনি করলাম, যে সত্য ওই মন্ত্রে নিহিত, যা কিছু তার সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ, তা আমি নিঃসংকোচে ত্যাগ করব। এই জন্য ত্যাগ করব, যে ও সব হিন্দুধর্মের অঙ্গ নয়।

হরিজন, 30 জানুয়ারি 1937

19

যজ্ঞ

ইহলোকে বা পরলোকে কোন প্রতিদানের আশা না রেখে পরার্থে যে নিষ্কাম কাজ করা যায়, তাই যজ্ঞ। এ শ্রম শারীরিক, বা মানসিক, বা কথা বলে, সবই হতে পারে। যজ্ঞ শব্দটির অর্থ বিশাল ও ব্যাপক। পরার্থে, মানে শুধু মানুষ নয়, জীবও বটে। কাজ করতে হবে অহিংস মনে। মানুষের ভোগার্থে পশুবলি দান, জীবের প্রাণনাশ, তাকে যজ্ঞ বলে গণনা করা যায় না।

বেদে অশ্ব, গরু, ইত্যাদি বলির যে কথা পাই, তাকে আমি অন্যায় মনে করি। ওই পশু হিংসার কথা মেনে নিলে আমরা সত্য ও অহিংসার বিচারে উত্তীর্ণ হব না। এ আমি সন্তুষ্ট মনে মেনে নিয়েছি। যে সব কথা ধর্মের নামে প্রসিদ্ধ, আমি তার ঐতিহাসিক অর্থ খোঁজার মতো ভুল করি না। সে ভাবে অর্থ অন্বেষণে নিজ অযোগ্যতাও স্বীকার করি। যোগ্যতা লাভের চেষ্টাও করি না। কেননা ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে জীবহিংসা সংগত যদি হয়ও, তবু আমি তো মানি অহিংসা পরম ধর্ম। ওই বিশ্লেষণ আমার কাছে অগ্রহনীয়, তাই তা ত্যাগযোগ্য।

উল্লেখিত ব্যাখ্যা অনুসারে বিচার করলে আমরা দেখতে পাব, যে কাজ করলে বিভিন্ন বহু ক্ষেত্রে অসংখ্য জীবের কল্যাণ হয়, —যে কাজ অসংখ্য মানুষ সহজে করতে পারে, —যে কাজে সেবা থাকে, তাই মহাযজ্ঞ, শুভ যজ্ঞ। একের সেবা করতে গিয়ে অন্য কারো অকল্যাণ চাওয়া বা করা যজ্ঞ নয়। যজ্ঞ থেকে তা পৃথক। এ কাজ বন্ধনসদৃশ। ভগবদগীতা তাই বলে, অভিজ্ঞতাও তাই শেখায়।

এমন যজ্ঞ ব্যতিরেকে এ জগৎ ক্ষণেকের তরেও টিকত না। তাই গীতাকার দ্বিতীয় অধ্যায়ে জ্ঞানের কিছু আলোকপাত করে তৃতীয় অধ্যায়ে জ্ঞানপ্রাপ্তির সাধনায় প্রবেশ করতে দিয়েছেন। স্পষ্ট বলেছেন, জন্ম থেকে যজ্ঞ আমাদের সঙ্গে আছে। যেহেতু এ মানব শরীর শুধুই পরমার্থসাধনের জন্য মিলেছে, তাই যজ্ঞ না করে যা কিছু খাই, সে তো চুরি করে খাচ্ছি। এমন সত্যকথা গীতাকার বলেছেন। যে শুদ্ধ জীবন যাপন করতে চায়, তার সকল কাজই যজ্ঞের রূপ নেয়। জন্ম ও যজ্ঞ দুয়ের মিলনের ব্যাখ্যা এই যে, আমরা জন্ম থেকে ঋণী। তাই আমরা এ জগতের গোলাম। সেবার বদলে মালিক যেমন গোলামকে খাওয়াপরা দেয়, তেমনি জগৎস্বামীও আমাদের কাছে কাজ পাবার জন্য অন্নবস্ত্রাদি দেন। সকৃতজ্ঞ চিত্তে তা স্বীকার করা উচিত। এ মনে করা ঠিক নয়, যা পাচ্ছি, সেটা আমার হক। না পেলে মালিককে দোষ দিও না। এ দেহ তাঁর। চাইলে বাঁচাবেন, নইলে মারবেন। এতে দুঃখ করার কিছু নেই, দয়াভিক্ষারও কিছু নেই। যদি নিজেদের অবস্থানটি বুঝে নিই, দেখব এটাই স্বাভাবিক। এতেই সুখ, এই আরো প্রার্থনীয়। এমন পরমানন্দ উপলব্ধির জন্য চাই অচলা বিশ্বাস। নিজের জন্য চিন্তা কোর না, সব সমর্পণ করো পরমেশ্বরকে, —এমন আদেশ তো আমি সব ধর্মগ্রন্থেই পেয়েছি।

তবে এ কথায় কেউ ঘাবড়ে যাবেন না। মনকে নিষ্কলুষ রেখে সেবা কার্যে যারা ব্রতী হয়, তাদের কাছে এর আবশ্যক দিন দিন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শ্রদ্ধাও বেড়ে চলে। যে স্বার্থত্যাগের জন্য প্রস্তুত নয়, নিজ জন্মের স্থিতি চিনতেও তৈরি নয়, তার কাছে সেবার সকল পথই কঠিন। ওর সেবাকার্যে তো স্বার্থের গন্ধ থাকবে। তবে এমন স্বার্থসর্বস্ব লোক জগতে কমই মিলবে। জেনে, বা অজানিতে, কোন না কোন নিঃস্বার্থ সেবাকার্য আমরা সবাই করে চলি। এ সব মনে রাখলে আমাদের পারমার্থিক সেবাকার্য উত্তরোত্তর বেড়ে তাতেই আমাদের প্রকৃত সুখ, এবং জগতের কল্যাণ। হয়তো কোনো সন্তের পুঁজি বা সঞ্চয় পরোপকারার্থে, যাকে বলা যায় সেবার্থে, —কথা তো তা নয়। মনুষ্যমাত্রেরই পুঁজি সেবার্থে। এমনটি হলে জীবনে ভোগের প্রতি বিরাগ আসে, জীবন হয়ে ওঠে ত্যাগসম্পৃক্ত। মানুষ তো ত্যাগ করেই ভোগ করে। পশু ও মানুষের জীবনে পার্থক্য এখানেই। জীবনের এই ব্যাথা জীবনকে করে তো নীরস, কঠিন, কোমলতাবিহীন, পারিবারিক জীবন নষ্ট হয়, এমন অভিযোগ তুলে অনেক লোক এ ব্যাখ্যাকে ত্রুটিপূর্ণ মনে করে। আমার বিচারে এটা ত্যাগ শব্দের অপব্যাখ্যা। ত্যাগব্রতী ঘরে আগুন দিয়ে

জঙ্গলে বাস করে না। জীবনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিতে ত্যাগের মাত্রা সংযোজন করে। এক গৃহস্থ জীবনে ত্যাগী ও ভোগী, দুই হতে পারে। মুচির জুতো সেলাই, কৃষকের চাষ করা, ব্যাপারীর ব্যবসা করা, নাপিতের দাড়ি কামানো, এর পিছনে ত্যাগের চিন্তা, অথবা ভোগ লালসা থাকতেই পারে। যে যজ্ঞার্থে ব্যবসা করে, সে কোটি কোটি টাকার ব্যবসা করেও লোকসেবার খেয়াল রাখবে, কাউকে ধোঁকা দেবে না, প্রবঞ্চনা করে মুনাফা ওঠাবে না, কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি থাকলেও বিনম্র থাকবে, কোটি কোটি টাকা কামাবার সময়ে কারো ক্ষতি করবে না। কারো ক্ষতি করার আগে কোটি টাকার লোকসান সইবে। কেউ হয়তো হাসবেন, ভাববেন, এমন ব্যবসায়ী আমার কল্পনাপ্রসূত। আমাদের সৌভাগ্য, প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে এমন ব্যবসায়ী আছেন। হয়তো তাঁদের সংখ্যা আঙুলে গোনা যায়। তবু একজনও যদি থাকেন, তবে তো ব্যাপারটা কল্পনাপ্রসূত থাকে না। বড়বালে এমন এক জনসেবক দর্জিকে দেখেছি। এমন একজন নাপিতকেও জানি। ইনিও অনুরূপ একজন। আমরা কে বলুন, বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত একটি সজ্জনকেও জানি না? চোখ খুলে খুঁজলে সকল পেশাতেই একেকজনকে পেতে পারি, যিনি যজ্ঞার্থে নিজ জীবিকার কাজ করেন। অবশ্যই তেমন যাজ্ঞিক, জীবিকা থেকে নিজের খরচও চালান। কিন্তু তাঁর ক্ষেত্রে জীবিকা আত্মার্থে নয়, নিজ ব্যয়টি এ ক্ষেত্রে গৌণ হয়ে গেছে। মোতিলাল আগেও দর্জির কাজ করতেন, জ্ঞান উপলব্ধ হবার পরেও তাই করেন। চিত্তে পরিবর্তন এসেছে বলে স্বীয় জীবিকা হয়ে উঠেছে যজ্ঞ। কাজটি পবিত্র হয়ে উঠেছে। কাজের সঙ্গে সঙ্গে অপরকে সুখী করবার চেতনাও এসেছে। এই সময়ে ওঁর জীবনে কল্যাণের আবির্ভাব ঘটেছে।

যজ্ঞময় জীবন, কলাকৃতির পরাকাষ্ঠা। প্রকৃত রস তাতেই আবদ্ধ। অমন জীবনেই রসের নিত্য নতুন ঝর্ণা প্রবাহিত হয়। মানুষ তা পান করে শেষ করতে পারে না। সে ঝর্ণাও শুকায় না কখনো। যজ্ঞকে যদি বোঝা মনে হয়, তা যজ্ঞ নয়, ত্যাগও নয়। ভোগের অন্ত নাশে, ত্যাগের অন্ত অমরত্বে। রস কোন স্বতন্ত্র বস্তু নয়। সে তো আমাদের জীবিকাবৃত্তির মধ্যেই আছে। একের বেলা নাটকে যবনিকা নামলে মজা, অন্যের বেলা আকাশের পটে নিত্য নব নব দৃশ্য দেখে মজা। রস তো পরিশীলনের বিষয়। শৈশবে যে বস্তুকে রস বলে শেখানো হয়, যাকে রস নামে জনতাকে পরিবেশন করা হয়, তাকেই বলা হয় রস। এমন উদাহরণও আছে, —যা এক জাতির কাছে রসময়, —তা অন্য জাতির কাছে রসহীন।

যজ্ঞকারী অনেক সেবক ভাবেন যে, তাঁরা নিষ্কাম মনে সেবা করছেন। ও সব লোকের ধারণা, দরকারে বা অদরকারে ওঁদের নেওয়ার পরোয়ানা মিলে গেছে। এমন ধারণা কোন সেবকের মনে এলে, তিনি আর সেবক থাকেন না, সর্দার বনে যান। নিজের সুবিধার চিন্তামাত্র সেবার মধ্যে থাকা ঠিক নয়। স্বামী, বা ঈশ্বরই সেবকের কি দরকার তা দেখেন। দেবার হলে তিনিই দেবেন। এটা মনে রাখবেন সেবক। যা আসছে, সবই আমার, এমন যেন না ভাবেন। যেটুকু নইলে নয়, তাই নাও। বাকি সব ত্যাগ করো। নিজের দরকারটুকু মিটলেই শান্ত হও। ক্রোধ কোর না, মনে এনো না সংকীর্ণতা। যজ্ঞ-সেবাই যাজ্ঞিকের পুরস্কার, সেবকের মজুরি। তাতেই তাদের সন্তোষ।

সেবাকার্যে বেগারীর জন্য মজুরি কাটা যায় না। শেষে দেয়া হবে বলে সরিয়ে রাখাও হয় না। নিজের কাজটি করলাম। পরের কাজ বিনা পয়সায় করতে হবে। এমনটি ভেবে, যেমন তেমন ভাবে যখন তখন, হেলাফেলায় পরসেবা করা চলে এমন যিনি ভাবেন, তিনি যজ্ঞের কিছুই বোঝেন নি। সেবাতে ষোল শৃঙ্গার করতে হয়। নিজের অধীত সকল কলা ওই কাজে উজাড় করে দিতে হয়। আগে ওই কাজ, পরে নিজের সেবা। সোজা কথা এই, শুদ্ধ যজ্ঞ কারীয় নিজের বলে কিছু থাকে না। তিনি সবই কৃষ্ণের পায়ে অর্পণ করেছেন।

যারভেদা মন্দির, XIV–XV অধ্যায়

20

হিন্দুধর্ম আমাদের জন্য কি করেছে?

আজ আমরা যা দেখি, তা শুদ্ধ হিন্দুধর্ম নয়, তার প্রহসন মাত্র। নইলে তার সপক্ষে বলার দরকার হোত না আমার। ধর্ম নিজেই বলত। যেমন, আমি নিজে যদি পূর্ণ শুদ্ধ হতাম, আপনাদের সামনে মুখ খোলার দরকারই হত না। ঈশ্বর নিজ মুখে কিছু বলেন না। মানুষ ঈশ্বরের যত কাছে আসে, ততই সে ঈশ্বর সদৃশ হয়ে যায়। হিন্দুধর্ম আমাকে শিখিয়েছে, আমার অন্তরস্থিত আত্মার শক্তির তুলনায় আমার শরীরের সাধ্যসীমা বড় কম।

প্রতীচ্যের মানুষ যেমন বস্তু ক্ষেত্রে আশ্চর্য সফল হয়েছে, তেমনি অধ্যাত্ম ও আত্মা ক্ষেত্রে হিন্দুধর্মের সাফল্য আরো বিস্ময়কর। কিন্তু এই মহান ও সুন্দর সম্পদ দেখার চোখ আমাদের নেই। পাশ্চাত্যবিজ্ঞানে যে প্রগতি এসেছে, তাতে আমরা চমৎকৃত। মনে হয়, ঈশ্বর ইচ্ছা করেই ভারতকে এ পথে প্রগতি আনার পথে বাধা দিয়েছেন। যাতে ভারত, বস্তুবাদের জ্বর প্রতিরোধ করার দায়িত্ব পালন করতে পারে। হিন্দুধর্মে এমন কিছু আছে, যা তাকে এখনো সঞ্জীবিত রেখেছে। ব্যাবিলন, সীরিয়া, পারস্য ও মিশর সভ্যতাকে প্রত্নস্তূপে পর্যবসিত হতে দেখেছে ভারত। চারদিকে তাকাও। কোথা গেল রোম, কোথায় য়ুনান? আজ কি গিবনবর্ণিত ইটালি বা প্রাচীন রোম, —রোমই তখন ইটালি, —কোথাও দেখতে পাই? য়ুনান ছেড়ে দিন। বিশ্ববিখ্যাত এটিক সভ্যতা কোথায় গেল? ফিরে এসো ভারতে, তার প্রাচীন শিলালেখ ও চিত্র দেখ। নিজের চারদিকে চেয়ে

দেখো। তুমি নিজেই মুগ্ধ হয়ে বলবে, 'এ তো দেখছি প্রাচীন ভারত আজও বেঁচে আছে।' এ কথা সত্যি যে এখানে গোবরের গাদা আছে। তার নিচেই লুকানো আছে বহুমূল্য মণিরত্ন। এ সভ্যতা বেঁচে থাকার কারণ, হিন্দুধর্ম যে আদর্শ তুলে ধরেছিল, তা বস্তুবাদের পথে নয়। আধ্যাত্মিককতার পথেই বিকাশ করতে হত।

হিন্দুধর্মের নানা অবদানের মধ্যে এক অনন্য অবদান, মূক প্রাণী ও মানুষের একাত্মতা। আমার মতে গো-পূজা এক মহান কাজ, যাকে আরো ছাড়িয়ে দেয়া যেতে পারে। ধর্ম-পরিবর্তনের যে আধুনিক প্রবৃত্তি, তা থেকে গো-পূজাকে মুক্ত রাখা খুবই দরকার। এ প্রচারের আবশ্যক নেই। এ নিজেই বলে, 'বাঁচার মত করে বাঁচো' এখন আমার তোমার কাজ হল ওই বাঁচার মত করে বাঁচা এবং তাহলেই আগামী যুগের হাতেই ছেড়ে দেওয়া যায় এর প্রভাব। তাঁরা যে বিভূতি দিয়েছেন, তা গ্রহণ করো। অপেক্ষাকৃত আধুনিক নামগুলি ছেড়ে দিলেও রামানুজ, রামকৃষ্ণ, চৈতন্য আছেন। এঁরা হিন্দুধর্মে এঁদের স্বাক্ষর রেখে গেছেন। হিন্দুধর্ম কোন অবস্থাতেই এক মৃতপ্রায় শক্তি বা মৃত ধর্ম নয়।

আশ্রমে যোগদান, সেও অনন্য। এর তুল্য কিছু এ জগতে নেই। ক্যাথলিক খ্রিষ্টানদের মধ্যে অবিবাহিতা মেয়েদের এক সম্প্রদায় আছে, যা আমাদের প্রাচীন ব্রহ্মচারীদের মত। তবে শেষেরটি কোন সংস্থা নয়, কেননা ভারতে প্রতি বালককে প্রথমে আশ্রমে থাকতে হয়। কি সুন্দর সে পরিকল্পনা। আজ আমাদের দৃষ্টি মলিন, চিন্তা আরো মলিন, শরীর সবচেয়ে নোংরা। কেননা আমরা হিন্দুধর্মকে অমান্য করছি।

আরো একটি প্রসঙ্গ আমি উল্লেখ করিনি। ম্যাক্সমুয়েলার চল্লিশ বছর আগে এ কথা বলেছেন। ইউরোপ এটি ধীরে ধীরে বুঝছে। পুনর্জন্ম কোন তত্ত্ব নয়, তথ্য। এটি হিন্দুধর্মের অবদান।

আজ বর্ণাশ্রমধর্ম আর হিন্দুধর্মকে ভ্রান্ত ভাবে উপস্থাপনা করছে ধর্মোপাসকরা। এটা দূর করে সংশোধন করতে হবে। আমরা অন্তরে সত্য হিন্দুধর্ম প্রতিষ্ঠা করব ও জানতে চাইব, তা আত্মাকে সন্তুষ্ট করছে কি না।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, 24 নভেম্বর 1927

22

ঈশ্বর ও মহাসভা

আমার ঈশ্বরই আমার সত্য ও প্রেম। ঈশ্বর হলেন নীতি ও সদাচার। নির্ভীকতা ঈশ্বর। ঈশ্বরই জীবন, এবং বিকাশের উৎস; আবার তিনি এ সবেরও অতীত। ঈশ্বরই অন্তরাত্মা। নাস্তিকে তিনি নাস্তিকতা। কেননা অপার প্রেমবশে ঈশ্বর তাকেও বাঁচতে দেন। তিনি মানবহৃদয়কে দেখেন। তিনি বুদ্ধি ও বাণীর অতীত। আমরা নিজেদের যতটা জানি, উনি আমাদের, আমাদের হৃদয়কে তারচেয়ে বেশি জানেন। যা বলছি, তাও আমি মানি না। কেননা তিনি জানেন, আমরা মুখে যা বলি, তা মনের কথা নয়; কেউ অজ্ঞতা বশে, কেউ জেনেশুনে এ কাজ করে। যারা ঈশ্বরকে ব্যক্তিরূপে দেখতে চায়, ঈশ্বর তাদের কাছে ব্যক্তিস্বরূপ। যারা তাঁকে স্পর্শ করতে চায়। তাদের কাছে তিনি সাকার। তিনি পবিত্রতম এক তত্ত্ব। যে তাঁকে শ্রদ্ধা করে, তাদের জন্যই তাঁর অস্তিত্ব। নানা জনের কাছে তাঁর নানা রূপ। তিনি আমার মধ্যে ব্যাপ্ত, আবার আমার বাইরেও তিনি। 'ঈশ্বর' শব্দটি কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার করা চলে, কিন্তু স্বয়ং ঈশ্বরকে তো কেউ কোন জায়গা থেকে তাড়িয়ে দিতে পারে না। ঈশ্বরের নামে প্রতিজ্ঞা করা হল। প্রতিজ্ঞা যদি কোন বস্তু না হয়, তবে তা কী? অন্তরাত্মা, ঈশ্বর শব্দের পক্ষে বড় সংকীর্ণ, বলপূর্বক তৈরি করা এক স্থান। তাঁর নামে ভয়ংকর নীতিহীন কাজ হয়েছে, অমানুষিক অত্যাচারও হয়েছে, কিন্তু তাতে তাঁর অস্তিত্ব বিলোপ পায় না। তিনি বড় ধৈর্যশীল, বড় সহিষ্ণু। আবার তিনি রুদ্রও বটেন। আজকের ও ভবিষ্যতের

পৃথিবীতে সর্বাধিক কাজ করবার শক্তি তাঁরই আছে। আমরা আমাদের প্রতিবেশী মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর সঙ্গে যেমন আচরণ করি, তিনিও আমাদের সঙ্গে তাই করেন। তাঁর কাছে অজ্ঞতার যুক্তি খাটে না। কিন্তু সব কিছুর পরেও তিনি ক্ষমাশীল, কেননা আমাদের অনুশোচনা করার সুযোগ দেন। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজাতন্ত্রবাদী তিনিই। কেননা ভাল-মন্দ যাচাই করার অধিকার তিনি আমাদের হাতেই ছেড়ে দেন। তিনি সর্বাপেক্ষা কঠিন হৃদয়। কেননা মুখ থেকে ছিনিয়ে নেন জলপাত্র, —স্বাধীনইচ্ছায় সামান্য কাজই করতে দেন, আর আমাদের অসহায়তা দেখে কৌতুকে হাসেন। হিন্দুধর্ম অনুসারে এ সবই তাঁর লীলা, তাঁর মায়া। তিনি বিনা আমরা কিছুই নই। যদি হই, তবে সর্বদা তাঁর গুণগান গাইতে হবে, —তাঁর ইচ্ছায় চলতে হবে। আসুন, তাঁর বাঁশরির সুরে আমরা নাচি। তাতে ভালই হবে।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, 5 মার্চ 1925

22

তিনটি মহান প্রশ্ন

এক বন্ধু গভীর বিনম্রতায় আমাকে হিন্দীতে তিনটি প্রশ্ন করেছেন :

এক : আপনি মনে করেন, বর্ণভেদ জন্মসূত্রে জাত। আবার এও বলেছেন, কারো কোন কাজ করতে মানা নেই। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বা বৈশ্যের গুণ সবাই অর্জন করতে পারে। এমন অবস্থায় বর্ণ-নির্দেশক পদবীর প্রয়োজন আছে কি? জন্ম থেকেই পদবী দান কেন? জন্মের উপর এত গুরুত্ব দান কেন?

দুই : আপনি অদ্বৈতবাদ মানেন। আবার এও বলেন, সৃষ্টি অনাদি অনন্ত ও সত্য। অদ্বৈতবাদ সৃষ্টির অস্তিত্বকে অস্বীকার করে। আপনি দ্বৈতবাদীও নন! কেননা আপনি জীবাত্মার স্বতন্ত্র কর্তৃত্বের উপর শ্রদ্ধাশীল। তাই আপনাকে অনেকান্তবাদী, বা স্যাদ্বাদী বলা ঠিক, না বেঠিক?

তিন : আপনি বারবার লিখেছেন ঈশ্বর দেহরহিত, বীতরাগী, স্বতন্ত্র ও উপাধিরহিত শুদ্ধাত্মা। অর্থাৎ সৃষ্টির জন্ম ঈশ্বর দেন নি, তিনি পাপপুণ্যের বিচার করতেও বসেন না। তবু আপনি ঈশ্বরেচ্ছার কথা বারবার বলেন। উপাধিরহিত ঈশ্বরের ইচ্ছা কেমন হতে পারে? তাঁর ইচ্ছাধীন আপনিই বা কেমন হতে পারেন? আপনার আত্মা, যা চায় তা করতে পারে। যদি আত্মা তা করতে অক্ষম হত, তার পূর্বজন্মের কর্মফলই তার কারণ, ঈশ্বর নন। আপনি সত্যাগ্রহী। শুধু মূঢ়দের বোঝাবার জন্য এমন অসত্য কথা তো বলছেন না। তবে এই ঈশ্বরেচ্ছার দৈববাদ কেন?

এক : আমি বর্ণভেদ মানি, সৃষ্টির নিয়মের সমর্থনার্থে। আমার মাতা-পিতার

কিছু গুণ ও দোষ জন্মসূত্রেই পেয়েছি। মনুষ্য যোনিতেই মানুষ জন্মায়। এই জন্মই বর্ণ নির্দেশ করে। প্রাপ্ত দোষ-গুণে আমি কিছু পরিবর্তন আনতে পারি। এতে কর্মেরও স্থান আছে। এক জন্মে পূর্বজন্মের সংস্কার সম্পূর্ণ ত্যাগ করা সম্ভব নয়। তা মানলে, যে জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণ, তাকে ব্রাহ্মণ বলে মেনে নিলেই সবরকমে লাভজনক হয়। অন্যরকম কাজ করলে ব্রাহ্মণ এই জন্মেই শূদ্র হয়ে গেল, পৃথিবী তাকে তবু ব্রাহ্মণ বলে মানল, এতে সংসারের কোন ক্ষতি নেই। এটা সত্যি যে, আজ বর্ণব্যবস্থার অর্থ পালটে যাচ্ছে। তাই এও সত্য যে, ও ব্যবস্থা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। তবু, আমি কেমন করে অস্বীকার করি সেই নিয়মকে, যার সত্যতা পদে পদে সফল হতে দেখছি? মানছি, অস্বীকার করলে বহু বিপদ থেকে বেঁচে যাব। তবে সে তো দুর্বুদ্ধির পথ। আমি তো সোচ্চার কণ্ঠে বলছি, বর্ণভেদ স্বীকার করি, উঁচু-নীচুর ভেদাভেদ মানি না। যে প্রকৃত ব্রাহ্মণ, সে সেবকেরও সেবক হয়ে থাকে। ব্রাহ্মণের মধ্যে ক্ষত্রিয়-বৈশ্য ও শূদ্রের গুণাবলী থাকতেই পারে। শুধু ওইসব গুণের চেয়ে তার মধ্যে ব্রাহ্মণের গুণ বেশি বেশি থাকা চাই। আজ তো বর্ণ কুমোরের চাকে আসীন। তা থেকে হাঁড়ি হবে, না কলসি, তা ঈশ্বর জানেন, নয় ব্রাহ্মণ জানে।

দুই : নিজেকে অদ্বৈতবাদী বলে মানি, এ কথা সত্য।' তবু দ্বৈতবাদের সমর্থনও করতে পারি। সংসার নিয়ত পরিবর্তনশীল। তাই সৃষ্টি অসত্য, অস্তিত্বরহিত বলা হচ্ছে। পরিবর্তন হলেও এর এমন এক রূপ আছে, যাকে তার স্বরূপ বলা যায়। ওই স্বরূপেই তার সত্তা নিহিত, এও আমরা দেখতে পাই। তাই তা সত্যও বটে। এ কারণে সত্য-অসত্য বলো, আমি আপত্তি করব না। এ কারণে আমাকে যদি অনেকান্তবাদী বা স্যাদ্বাদী বলো, তাতেও আপত্তি নেই। স্যাদ্বাদ বলতে যেমনটি বুঝি, তেমন মানি। তবে পণ্ডিতরা তার যে রূপ মানেন, আমি তা মানি না। তাঁরা আমার সঙ্গে বিবাদ করলে আমি হেরে যাব। স্ব-অভিজ্ঞতায় দেখেছি, আমার বিচারে আমি সর্বদাই সঠিক। কিন্তু প্রামাণিক টীকাকারদের বিচারে আমার বহু কথাই ত্রুটিপূর্ণ। তবে জানি, নিজ-নিজ বিচারে আমরা দুজনেই সঠিক। এ বিশ্বাস রাখি বলে কাউকে হঠাৎ মিথ্যাবাদী ও কপট বলে মানতে পারি না। সাতটি অন্ধ, একটি হাতির সাত রকম বর্ণনা দিয়েছিল। স্ব-স্ব বিচারে তারা সঠিকই ছিল একে অপরের বিচারকে ভুল বলেছিল। সে বর্ণনা জ্ঞানীর দৃষ্টিতে সত্যও বটে, অসত্যও বটে। আমার এ অনেকান্তবাদ খুবই প্রিয়। ওর কারণেই আমি মুসলমানের দৃষ্টিকোণ থেকে মুসলমানকে, এবং

খ্রিষ্টানের দৃষ্টিকোণ থেকে খ্রিষ্টানকে পরীক্ষা করতে শিখেছি। আগে আমার বিচারকে ভুল বুঝলে আমার ভারি রাগ হত। এখন আমি তার মতামতটি তার দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখি। তাই তাকেও ভালবাসতে পারি। আমি বড় ভালবাসার কাঙাল। অনেকান্তবাদের মূলে আছে সত্য ও অহিংসা।

তিন : ঈশ্বরকে যে রূপে মানি, সে ভাবেই তাঁর বর্ণনা করি। মানুষকে ভ্রান্তিতে ফেলে নিজের অধঃপতন ঘটাব কেন? আমার তো কোন পুরস্কার চাই না। ঈশ্বরকে মনে করি কর্তা-অকর্তা দুইই। সাদ্বাদ থেকেই এ উপলব্ধি জন্মেছে। জৈনের অবস্থান থেকে আমি তাঁর কর্তৃত্ব পালন করি। রামানুজের অবস্থান থেকে তাঁর অকর্তৃত্ব। অচিন্ত্যনীয়কে চিন্তা করি, অবর্ণনীয়কে বর্ণনা করি, অজ্ঞেয়কে জানতে চাই। তাই তো আমার ভাষা তোতলা, সবটা বলতে পারি না, মাঝে মাঝে বাঁকা কথাও বলি। এ জন্যই ব্রহ্মার জন্য বেদ অলৌকিক শব্দ সম্ভারে রচিত, তাকে 'নেতি' বলা হয়। অস্তি, সৎ, সত্য, ...এটুকু বলতে পারি। আমরা মানুষ। আমাদের জন্মদাতা মাতা-পিতা আছেন। ওঁদের জন্মদাতাও আছেন...তাই সকলের জন্মদাতা একজনই। এ কথা স্বীকারে কোন পাপ নেই, বরঞ্চ পুণ্য আছে, এ কথা স্বীকার করা ধর্ম। তিনি নেই, তো আমরাও নেই। তাই আমরা স্বরে স্বর মিলিয়ে তাঁকে ডাকি পরমেশ্বর, ঈশ্বর, শিব, বিষ্ণু, রাম, আল্লা, খুদা, দাদা হোরমজ, যিশু, গড এমন অনেক, অসংখ্য নামে। তিনি এক ও অনেক; অণুর চেয়েও ক্ষুদ্র, হিমালয়ের চেয়েও বড়ো। তিনি সমুদ্রের এক বিন্দু জলে থাকতে পারেন। আবার সপ্ত সাগর এক হলেও তাঁকে ধারণ করতে পারে না, তিনি এতই বিশাল। তাঁকে জানতে হলে বুদ্ধি কি করবে? তিনি তো বুদ্ধির অতীত। ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানার জন্য শ্রদ্ধা চাই। আমি বুদ্ধির সাহায্যে অনেক তর্কবিতর্ক করতে পারি। আবার কোন কট্টর নাস্তিকের সঙ্গে তর্কে হেরে যেতেও পারি। তবু আমার শ্রদ্ধা, আমার বুদ্ধির চেয়ে অনেক বেশি। তাই সমস্ত সংসার বিরোধিতা করলেও আমি বলব, ঈশ্বর আছেন, অবশ্যই আছেন।

তবু, যিনি ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে চান, তাঁর সে অধিকার আছে। কেননা ঈশ্বর দয়ালু, রহিম, ও রহমান। তিনি তো মাটিতে তৈরী কোন রাজা নন যে, স্বঅস্তিত্ব প্রমাণের জন্য সিপাই রাখতে হবে। তিনি আমাদের স্বাধীনতা দেন। আবার নিজের দয়ার শক্তিতে আমাদের শাসনও করেন। আমাদের মধ্যে যদি কেউ তাঁর শাসন না মানে, তিনি বলেন, 'মনের সুখে আমার শাসন অমান্য করো। তবু আমার সূর্য তোমায় আলো দেবে। আমার মেঘ তোমার জন্যও বৃষ্টি দেবে।

নিজেকে সপ্রমাণ করার জন্য তোমার উপর বলপ্রয়োগ করার দরকার নেই আমার।' এমন ঈশ্বরের সত্তাকে যে না মানে, সেজন অপরিণত বুদ্ধি নাবালক। কিন্তু যে সব কোটি কোটি বুদ্ধিমান মানুষ ঈশ্বরকে মানেন, আমি তাঁদেরই একজন। তাঁকে হাজার বার প্রণাম করলেও ক্লান্ত হই না।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, 21 জানুয়ারি 1926

23

ঈশ্বর আছেন

বিশ্বের কোণে কোণে ব্যাপ্ত এক অব্যক্ত, অপরিভাষিত, রহস্যময় শক্তি অবশ্যই আছে। আমার তাতে বিশ্বাস আছে, যদিও তা চোখে দেখতে পাই না। তা সেই অদৃশ্য শক্তি, যার প্রভাব অনুভব করি, প্রমাণের জালে ধরতে পারি না। আমি ইন্দ্রিয় দিয়ে যে সব বস্তু অনুভব করতে পারি, ওই শক্তি সতত সে-সব থেকে ভিন্ন। তা অতীন্দ্রিয়।

তবে একটি সীমা অবধি ঈশ্বরের অস্তিত্ব বোঝা সম্ভব। সংসারে সামান্য কাজ করে যারা, তারা তো জানে না সব কিছু চালাচ্ছে কে, —কেমন করে চালাচ্ছে, —তবে এটা নিশ্চিত বোঝে, যে অবশ্যই কোন শক্তি এ জগৎ সংসার চালাচ্ছে। গতবছর মহীশূর ভ্রমণকালে আমি অনেক গরিব গ্রামীণ লোকের সঙ্গে কথা বলি। মহীশূরের শাসক কে, তাও তারা জানত না। এটুকু বলেছিল, কোন দেবতা শাসন করেন। ওই গরিবরা যদি রাজ্যশাসক সম্পর্কে এত কম জানে, আমার অবস্থা তবে কি? ওদের শাসকের তুলনায় ওরা কত তুচ্ছ। ঈশ্বরের তুলনায় আমি তো তুচ্ছাতিতুচ্ছ। তাই যদি আমি ঈশ্বরের অস্তিত্ব, যিনি রাজার রাজা, তাঁর অস্তিত্ব ধারণা করতে না পারি, তাতে বিস্ময়ের কি আছে? গ্রামীন মহীশূরবাসীদের মতো যদি এতটুকু বুঝি, যে ব্রহ্মাণ্ডে একটি ব্যবস্থা আছে। এক অটল নিয়ম বিশ্বের প্রতি বস্তু ও প্রাণীকে চালাচ্ছে। এ কোন অন্ধ কানুন নয়। কেননা কোন অন্ধ ও বিবেকশূন্য ব্যবস্থা প্রাণধারী জীবদের আচরণ পরিচালনা

করতে পারে না। আর এখন তো স্যার জগদীশচন্দ্র বসু আশ্চর্য এক আবিষ্কার করেছেন। তার ভিত্তিতে বোঝা যাচ্ছে, পদার্থেরও প্রাণ আছে। বিশ্বের সকল জীবন পরিচালনাকারী নিয়মই ঈশ্বর। নিয়ম ও নিয়ামক এক এবং অভিন্ন। এই নিয়ম-নিয়ামক-ঈশ্বর বিষয়ে আমি এত কম জানি যে, তাঁর অস্তিত্ব স্বীকারে নারাজ হওয়া উচিত নয়।

যেমন, কোন ভৌতিক শক্তিকে অস্বীকার করলাম, সে বিষয়ে অজ্ঞই থাকলাম, তাতে তো তার প্রভাবমুক্ত হতে পারছি না। তেমনিই, ঈশ্বর বা তাঁর নিয়মকে অস্বীকার করলে আমি তার প্রভাবমুক্ত থাকব না। দ্বিতীয় পন্থা, —নতশিরে নির্বাক থেকে ঈশ্বরীয় শক্তিকে মেনে নিলে জীবনযাত্রা সরল সহজ হয়ে যায়। যেমন কোন ব্যক্তি, সংসারে যাঁর অধীনে আছে, তাঁর কর্তৃত্ব স্বীকার করে নিলে তার নিজের জীবন সমস্যামুক্ত হয়।

আমার মনে হয়, এ বিশ্ব তো সতত পরিবর্তনশীল এবং নশ্বর। এর পিছনে কোনো সচেতন শক্তি আছে। তা অপরিবর্তনশীল, কোণ হতে কোণে বাঁধা একই সুতোয় তা সৃষ্টি-সংহার ও নব নব সৃষ্টি, করে চলে। সেই সর্বজ্ঞ শক্তিই ঈশ্বর। শুধু ইন্দ্রিয় দ্বারা সংবাহনে যে সব বস্তুতে বিশ্বাস জন্মায়, সে সকলই নশ্বর ও অনিত্য। ঈশ্বর নিত্য ও অবিনশ্বর।

ওই শক্তি মঙ্গলকারী, না অমঙ্গলকারী? আমার কাছে তা পূর্ণ মঙ্গলদায়ী। তাই দেখি, মৃত্যুর বাতাবরণে জীবন, অসত্যের আড়ালে সত্য, অন্ধকারের ভিতর আলোর প্রকাশ স্ব-অস্তিত্বে বিরাজমান। তাই আমি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, ঈশ্বরই জীবন, সত্য ও প্রকাশ। তিনি প্রেম ও পরম শিব-তত্ত্ব।

কেবল বুদ্ধিকে সন্তুষ্ট করতে পারেন যিনি, তিনিই ঈশ্বর নন। তিনিই ঈশ্বর, যিনি হৃদয়ের অধীশ্বর। হৃদয়ের পরিবর্তন যিনি ঘটাতে পারেন। অতি নগণ্য কাজেও ঈশ্বর সেবকরা তাঁকে অনুভব করতে পারেন। এটা তখনি সম্ভব, যখন সে-সেবকের সত্য দর্শন ঘটে। পঞ্চেন্দ্রিয় লব্ধ জ্ঞানের চেয়েও সে দর্শন আরো সত্য ও বিশুদ্ধ। ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানকে যত বিশুদ্ধই মনে হোক, সে তো ভুল হতে পারে। ইন্দ্রিয় বারবার আমাদের ধোঁকা দেয়। অতীন্দ্রিয় জ্ঞানে কোন ভ্রান্তি নেই। বাইরের প্রমাণ দেখিয়ে বিশ্বাস করানো যায় না। যার ঈশ্বর বিষয়ে সত্যই উপলব্ধি হয়েছে, তার আচার-ব্যবহার ও চরিত্র পরিবর্তন দ্বারা প্রমাণ মেলে।

সকল দেশ ও জাতির নবী-পয়গম্বর ঋষি-মুনি, এঁদের উপলব্ধিও অনুরূপ। তাঁদের অবিচল বিশ্বাসে কখনো ফাটল ধরে না। এ প্রমাণকে অস্বীকার করা, নিজের অস্তিত্বকেই অস্বীকার করার সামিল।

অটুট বিশ্বাসের মধ্যে এ অনুভব প্রতিফলিত হয়। যিনি নিজে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করতে চান, তাঁর জীবন্ত বিশ্বাসের শক্তিতেই তা করতে পারবেন। বিশ্বাস তো কোন বাহ্য প্রমাণ দিয়ে নিরূপণ করা যায় না। তাই সবচেয়ে নিরাপদ উপায় হল সংসারের নৈতিক নিয়মকে সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানে তা মেনে চলা। নৈতিক নিয়ম হল সত্য ও প্রেমের নীতি। যিনি সত্য ও প্রেমের বিরোধী সব কিছু বর্জন করবার সংকল্পে দৃঢ়, —তাঁর পক্ষেই উপরোক্ত পথ সবচেয়ে ফলপ্রসূ হবে।

অশুভের অস্তিত্বের আর কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখি না। অমঙ্গল কাজ করার ইচ্ছার অর্থ, নিজেকে ঈশ্বরের সমকক্ষ মনে করা। তাই আমি নম্রচিত্তে অমঙ্গলকে অমঙ্গল বলেই মেনে নিয়ে সন্তুষ্ট। তিনি সংসারে অমঙ্গলকেও ঠাঁই দিয়েছেন, এ জন্য ঈশ্বরকে বলি সহিষ্ণু ও ধৈর্যশীল। জানি, ঈশ্বরে কোন অমঙ্গল নেই। তিনি সতত শুদ্ধশুচি। তারপরেও অমঙ্গল যদি থাকেও, তিনি তা থেকে দূরে থাকেন।

এও জানি, প্রাণকে পণ রেখে অমঙ্গলের বিরুদ্ধে লড়াই করতে না পারলে, কোনদিন ঈশ্বরকে জানতে পাব না। আমার তুচ্ছ ও সামান্য অনুভব আমার এ বিশ্বাসকে পুষ্ট করেছে। যত বেশি করে শুদ্ধ ও পবিত্র হবার চেষ্টা করি, মনে হয় ততই কাছে চলে আসি ঈশ্বরের। আজ আমার শ্রদ্ধা তো নাম-মাত্র। তবু তাঁকে কিছুটা কাছের বলে মনে হয়। যখন আমার শ্রদ্ধা হবে হিমালয়ের মতো অটল, তার তুষার শৃঙ্গের মত শুভ্র ও উজ্জ্বল, তখন তাঁকে কত না কাছের বলে মনে হবে? পত্র-লেখককে বলি, তিনি নিউম্যানের প্রার্থনাটি পড়ুন।

নিজ অনুভবের ভিত্তিতে নিউম্যান এ সংগীত রচনা করেছিলেন :

> এই ঘনায়মান অন্ধকারে, হে প্রেমময় জ্যোতি
> আমার পথে আলো দেখাও;
> ঘর বড় দূরে, রাত বড় আঁধার,
> হে জ্যোতি, আমার পথে আলো দেখাও;
> আমার অশক্ত পায়ে বল দাও,
> যত দূরে যাক আমার পথ, যেন আলোকদীপ্ত থাকে—

তা তো বলছিনা আমি, বলছি একবার পা ফেলি,
ততটুকু পথে আলো পেলেই আমার যথেষ্ট হবে।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, 11 অক্টোবর 1928

24

ভাষণ : লসেনের* সভায়

২

আপনারা জিজ্ঞাসা করেছেন, ঈশ্বর সত্য, এমন বলি কেন। শৈশব থেকে কৈশোরকালে হিন্দুধর্মশাস্ত্রে ঈশ্বরের সহস্রনাম (বিষ্ণুর সহস্রনাম) জপ করতে শেখানো হয় আমাকে। ধার্মিক শিক্ষা দেবার মত ছোটখাট অনেক কিছু ছিল বাড়িতে। একটি ছোট বই ছিল। যাতে ঈশ্বরের সহস্রনাম ছিল। কিন্তু সহস্রটি নামেও ঈশ্বরের নামমালা সম্পূর্ণ হয় না। আমি মানি, আমার মন বলে এ সত্য যে, যত প্রাণী আছে, ঈশ্বরের নামও ততই। তাই বলি ঈশ্বর অনাম। যেহেতু তাঁর অনেক রূপ, আমি বলি তিনি অরূপ। তিনি আমাকে বহু ভাষায় কথা বলেন, আমি বলি তিনি অবাক। এই তো! এ ভাবেই অধ্যয়ন করেছি ইসলাম, কেননা ইসলামেও তাঁর অনেক নাম। যিনি বলেন ঈশ্বরই প্রেম,—তাঁর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে আমিও বলি ঈশ্বরই প্রেম। তবে হৃদয়ে গভীরে ডুবে বলি, ঈশ্বর প্রেমরূপী, —সর্বাধিক সত্য, তিনি সত্যরূপী। মানুষী ভাষায় ঈশ্বরের সম্পূর্ণ বর্ণনা সম্ভব হলে বলতাম, আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, ঈশ্বর হলেন সত্য। দু' বছর আগে, আরো এগিয়ে আমি বললাম, সত্যই ঈশ্বর, ঈশ্বরই সত্য, সত্যই ঈশ্বর। এ দু'য়ের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য নিশ্চয় লক্ষ করেছেন। এত বছর ধরে সত্যের অনুসন্ধান করে আমি এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি। সত্যের কাছে পৌঁছবার নিকটতম পথ প্রেম মার্গ। এও দেখলাম ইংরেজিতে প্রেম (লাভ) শব্দের বহু অর্থ আছে। কাম অর্থে মানুষের যে ভালবাসা তা মানুষকে নিচে নামাবার অর্থেও ব্যবহার করা যায়।

*সুইজারল্যাণ্ডে

আরো দেখেছি, অহিংসার সমার্থক যে প্রেম, তার উপাসক দুনিয়ায় কম সংখ্যক। নিজ সন্ধানের পথে এগোতে এগোতে "ঈশ্বর হলেন প্রেম" (তবু) "ঈশ্বরই হলেন প্রেম" এ কথার প্রতিবাদ করিনি। "প্রেম" শব্দের অর্থ অনেক, তাই এ কথা বোঝা খুব কঠিন। কামবিকার অর্থে মানব-প্রেম এক স্থূল ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। তবে সত্যের কোন দ্বিতীয় অর্থ নেই এবং সত্যের প্রয়োজনীয়তা বা শক্তি একজন নাস্তিকও অস্বীকার করে না। শুধু তাই নয়। ওরা যখন নিজেরা সত্য খোঁজে, তখন ঈশ্বরের অস্তিত্ব অসংকোচে অস্বীকার করে। ওদের দিক থেকে দেখলে তা ঠিকই আছে। ওদের সঙ্গে বিতর্কের জন্য আমার মনে হয়েছে, ঈশ্বর সত্য-রূপ নয়, আমার বলা উচিত, সত্যই ঈশ্বর। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে চার্লস ব্র্যাডলিকে। তিনি এক মহান ইংরেজ। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে তিনি মারা গেছেন। তিনি পরমোৎসাহে নিজেকে নাস্তিক বলতেন। ওঁর জীবন বিষয়ে কিছু জানি, তাই কোনদিন মনে করিনি উনি নাস্তিক। ঈশ্বরকে সমীহ করে চলেন, এমন লোকই বলি ওঁকে। উনি তা মানতেন না। আমার কথা শুনে ওঁর মুখ লাল হয়ে যেত। আমি বলতাম, না, ব্র্যাডলি সাহেব. না। আপনি ঈশ্বরকে সমীহ করে চলার মানুষ নন, তবে সত্যকে সমীহ করেন। যেমন অনেক যুবকের, তেমনি ওঁরও মুখ নির্বাক করে দিতাম এই বলে,—সত্যই ঈশ্বর, ঈশ্বর সত্য, এ কথার একটি রূঢ় দিকও আছে। কোটি কোটি লোক ঈশ্বরের নামে অবর্ণনীয় অত্যাচার করেছে। বিজ্ঞানীরাও সত্যের নামে নিষ্ঠুরতা করেন। সত্য ও বিজ্ঞানের নামে পশু-ব্যবচ্ছেদ করে পশুর সঙ্গে অমানবিক নিষ্ঠুরতাই করা হয়। আপনারা এ ঈশ্বরকে "সত্য" বা যাই বলুন, আমি এঁকে মানতে পারি না। সার কথা এই, যে নামেই ঈশ্বরকে বর্ণনা করুন, পথটি কঠিন। মানব-মস্তিষ্কের ক্ষমতা সীমিত। মানুষের বোধের অগম্য এমন এক সত্তা নিয়ে ভাবছি আমরা। আমাদের মস্তিষ্কের সীমাবদ্ধতার মধ্যেই কাজটি করতে হবে। হিন্দু তত্ত্বজ্ঞানে আরো বলেছে, একা ঈশ্বর অস্তিত্ববাদ, আর কোন বস্তুর সত্তা নেই। ইসলামের যে প্রসিদ্ধ উক্তিকে "কলমা" বলা হয়, তাতে এ কথাই জোর দিয়ে বলা ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মুসলমানদের প্রতি ইবাদতে কথাটি দু'বার বলতে হয়,—সেই সরল কথাটি হল, শুধু আল্লাহ্ আছেন, আর কিছু নেই। এ কথা সত্যের সঙ্গেও জড়িত। সংস্কৃতে সত্যার্থে শব্দটি হ'ল "সৎ",—তার মানেও হ'ল "যা আছে"। এই কারণে, এবং আরো অনেক কারণেই বলি, এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি, সত্যই ঈশ্বর। আপনারা সত্যকে ঈশ্বর রূপে পেতে চাইলে একমাত্র পথ প্রেম, অর্থাৎ অহিংসার সাধনা। সাধন আর

সাধ্য, অর্থ একই। তাই নিঃসংকোচে বলব, ঈশ্বরই প্রেম।

প্রশ্ন : তবে সত্য কী?

উত্তর : প্রশ্নটি কঠিন। তবে নিজের জন্য আমি এক উত্তর ভেবে নিয়েছি,—আমার অন্তরাত্মা যা বলে, তাই সত্য। আপনি বলবেন, ভিন্ন ভিন্ন মানুষ, ভিন্ন ভিন্ন, অথবা এ-ওর বিরোধী সত্যের কল্পনা কি ভাবে করে?

এর উত্তর,—মানুষের মন অসংখ্য ভাবে কাজ করে। প্রতি মানুষের মনের বিচার একইরকম হয় না। ফলে যা একের কাছে সত্য, তা অপরের কাছে অসত্য। যাঁরা কোন পদ্ধতি প্রয়োগ করেন, তাঁরা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, যে পদ্ধতি প্রয়োগকালে কিছু শর্ত পালন করা আবশ্যক। বিজ্ঞানক্ষেত্রে যেমন প্রয়োগকারী সকলকেই একটি মূল পদ্ধতি মানতে হয়,—তেমনি আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে কিছু শর্ত পালন করা খুব দরকার তাঁদের,—যাঁরা প্রয়োগ করার ইচ্ছা রাখেন। সবাই বলেন, তাঁর অন্তরাত্মা তাঁকে কিছু বলছে। তাই আপনাকেও সে কণ্ঠ শুনতে হবে। তখন আপনি স্বীয় সাধনায় যেমন-যেমন এগোবেন, নিজের উপলব্ধি বিষয়েও বোধ জাগবে। অনুভবের ভিত্তিতে আমার বিশ্বাস জন্মেছে, যিনি আন্তরিক ভাবে ঈশ্বর ও সত্যের খোঁজ করতে চান, তাঁকে কিছু ব্রত পালন করতে হবে। যেমন : সত্য বলা, চিন্তাতেও সত্য থাকা, ব্রহ্মচর্য, অহিংসা, গরিবী ও অপরিগ্রহ। এই সুন্দর ব্রত যদি পালন না করেন, তবে প্রয়োগ বা পরীক্ষা শুরু করা ঠিক হবে না। এর আরো নিয়ম আছে, এখানে তা আলোচনা করব না। যাঁরা এগুলি পালন করেছেন, তাঁরা জানেন যে সকল মানুষই এ দাবি করতে পারে না যে, তারা অন্তরাত্মার কণ্ঠস্বর শুনেছে। আজ পৃথিবীর সামনে এত অসত্য বাক্য উচ্চারিত হচ্ছে যে বসুধা ক্লান্ত। এর কারণ, প্রতিজনই আবশ্যকীয় নিয়ম পালন না করেই স্বীয় অন্তরাত্মার নির্দেশ শুনেছে বলে দাবি করছে। তাই, বিনম্রচিত্তে বলি, যার বিনয় নেই, তার সত্য প্রাপ্তি হবে না। আপনারা সত্য-রূপ সমুদ্র স্রোতে সাঁতার কাটতে চান, তো নিজেকে নিঃস্ব শূন্য করুন। স্বীয় অহং বিসর্জন দিন। এই মনোমুগ্ধকর বিষয়ে আজ রাতে আর কিছু বলব না।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, 31 ডিসেম্বর 1931

25

ভাষণ : ত্রিবান্দ্রমে ইলোয়া সভায়

মহান পদ্মনাভ মন্দিরে যা কিছু দেখলাম, তার উল্লেখ করতেই হয়। বিশুদ্ধ, আধ্যাত্মিক পুনর্জাগরণ বিষয়ে আমি যা বলে চলেছি, তার উল্লেখ করলে প্রসঙ্গটি সবচেয়ে পরিষ্কার হবে। মাতা-পিতা আমার মনে যে শ্রদ্ধা-ভক্তি সঞ্চার করেন, তা নিয়েই যৌবনে মন্দিরে যেতাম। তবে ইদানিং কয়েক বছর আর মন্দিরে যাই না। যখন থেকে অস্পৃশ্যতা নিবারণে কাজ করছি,—তখন থেকে এমন কোন মন্দিরে যাই নি, তথাকথিত অস্পৃশ্যদের জন্য যার দ্বার অবারিত নয়। তাই আজ প্রভাতে মন্দিরে যা দেখলাম, তা এতই নতুন। এই ঘোষণার পর যে অবর্ণ হিন্দুরা মন্দিরে ঢুকলেন, তাঁরাও সে নবীনতা দেখেছেন। কল্পনার পাখায় ভর দিয়ে আমার মন পৌঁছেছিল প্রাগৈতিহাসিক কালে। তখন মানুষের মনে ঈশ্বর বোধ জেগেছে। পাষাণ ও ধাতুর মূর্তি গড়ে মানুষ সে বোধকে মূর্ত করতে শুরু করেছে। স্পষ্ট লক্ষ করলাম, যে পূজারী সুন্দর হিন্দীতে আমাকে প্রতিটি প্রতিমা বিষয়ে বোঝাচ্ছিলেন, তিনি এ কথা বলেন নি যে এর প্রতিটিতে ঈশ্বর আছেন। ওই বিশেষ কথাটি বলেন নি বলেই আমার মনে হল, এটি, এবং প্রত্যেক মন্দিরই এক মহাসেতু। ঈশ্বর নামক অদৃশ্য, অলক্ষ্য, অবর্ণনেয় শক্তির সঙ্গে সৃষ্টিসাগরের এক তুচ্ছ বিন্দু মানবের সম্পর্ক স্থাপনের মহাসেতু। আমরা সবাই দার্শনিক নই। আমরা মাটির পুতুল, মাটিকেই লেপটে আছি। অদৃশ্য ঈশ্বর বিষয়ে চিন্তামাত্র করে সুখ পাই না। হয়তো সেজন্যই এমন কিছু খুঁজি যাকে দেখতে ও ছুঁতে

পারি। যার কাছে শ্রদ্ধায় অবনত হতে পারি। তেমন বস্তু কোন বই, পাথরে তৈরি কোন শূন্য ইমারত, বা ইট ও পাথরে তৈরি সেই প্রাসাদ, যাতে অনেক প্রতিমা বিদ্যমান,—যা কিছু হতে পারে। কিছু লোক তৃপ্তি পাবেন শূন্য হর্ম্য দেখে,—আবার কেউ, সে হর্ম্যে প্রতিমা দেখতে না পেলে খুশি হবেন না। আমার বক্তব্য, অন্ধবিশ্বাসের আবাসগৃহ মনে করে এ মন্দিরে আসবেন না। অন্তরে শ্রদ্ধা নিয়ে যান। যতবার যাবেন, ততবারই শুদ্ধ শুচি হয়ে, জীবন্ত ঈশ্বরে নিজ বিশ্বাস আরো দৃঢ় করে বেরোবেন।

হরিজন, 23 জানুয়ারী 1937

26

গীতার অর্থ

এক বন্ধু প্রশ্ন করছেন :

> গীতার বার্তা কি? হিংসা, না অহিংসা? মনে হয় এ প্রশ্নের মীমাংসা হবে না কখনো। আরো বক্তব্য, আমরা গীতায় কি দেখতে চাই, তা থেকে কেমন বার্তা চাই; দ্বিতীয় কথা, গীতা-পড়ে মনে কি প্রভাব পড়ে। যাঁর হৃদয়ে প্রতীতি জন্মেছে, অহিংসা-তত্ত্বই জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি,—তাঁর ক্ষেত্রে প্রশ্নটি গৌণ। তিনি তো বলবেন, গীতা থেকে যদি অহিংসার বার্তা মেলে, আমার কাছে সেই স্বীকার্য, এমন ভব্য গ্রন্থ থেকে অহিংসার মত ভব্য ধার্মিক সিদ্ধান্ত বেরোনোই উচিত। না বেরোয়, তাতেই বা কি? আমি গীতাকে শ্রদ্ধা করব, তবে তাকে প্রমাণ গ্রন্থ বলে মানব না।
>
> কাজের চাপ থেকে কিছু সময় বের করে এর উত্তর দেন তো ভাল হয়।

এমন প্রশ্ন আসবেই। যে সামান্য অধ্যয়ন করেছে, তাকে যথাশক্তি জবাব দিতেও হবে। এঁর উত্তর দেবার পরেও শেষ কথাটি এই, মানুষের হৃদয় তাকে যা বলবে, সে তেমনই করবে। প্রথমে হৃদয়, পরে বুদ্ধি। প্রথমে সিদ্ধান্ত, পরে প্রমাণ। প্রথমে স্ফুরণ, পরে তার সপক্ষে তর্ক। প্রথমে কর্ম, পরে বুদ্ধি। তাই বলা হয়, বুদ্ধি কর্মানুসারিণী। মানুষ যা করে, বা করতে চায়, তা সমর্থন করার জন্য প্রমাণও খুঁজে বের করে নেয়।

তাই মনে করি, আমি গীতা বলতে যা বুঝি, তা সকলের মনোমত হবে না। এ অবস্থায় যদি এটুকুই বলি, যে গীতার নিজস্ব ব্যাখ্যায় আমি কি করে উপনীত হলাম,—ধর্মশাস্ত্রে অর্থ উপলব্ধি করার জন্য আমি কোন্ কোন্ সিদ্ধান্তকে সসম্মানে

গ্রহণ করলাম, সেই যথেষ্ট হবে। "পরিণাম যাই হোক, আমাকে তো যুদ্ধ করতে হবে। যে শত্রু মরণযোগ্য, সে তো মৃতই,—আমি তাকে মারবার নিমিত্ত মাত্র।"

1889 সালে শ্রীগীতা-র সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। সেদিন আমার বয়স 20 বছর। সে সময়ে অহিংসা-ধর্মের সামান্যই বুঝি। শত্রুকেও জয় করতে হয় প্রেম দিয়ে, এ আমি শিখি গুজরাটী কবি শ্যামল ভট্টের গান "পাপীকে আপন করতে না পারো, খেতে তো দেবে" থেকে। এতে নিহিত সত্য গভীর ভাবে হৃদয়ঙ্গম করলাম। কিন্তু তখনো আমার মধ্যে জীবে দয়ার প্রেরণা জাগে নি। তার আগেই দেশে মাংস খেয়েছি। মনে করতাম সাপ ইত্যাদিকে হত্যা করা ধর্ম। মনে পড়ে, ছারপোকা ইত্যাদি মারতাম। এমনও মনে আছে, একটা বিছে মেরেছিলাম। এখন বুঝি, বিষাক্ত প্রাণীকেও মারা ঠিক না। তখন ভাবতাম, ইংরেজের সঙ্গে সশস্ত্র লড়াইয়ের উদ্যোগ নিতে হবে। "ইংরেজ রাজত্ব করছে, এতে বিস্ময়কর কি আছে।" এই মর্মে এক কবিতা আওড়াতাম। ওই যুদ্ধোদ্যোগের জন্যই মাংসাহার করতাম। বিলেত যাবার আগে আমি ও রকমই ভাবতাম। মাংসাহার থেকে রক্ষা পেয়েছি, কেননা মাকে যে কথা দিয়েছি, তা আমরণ পালন করব, এমন সংকল্প করি। বহু বিপদ থেকে আমাকে বাঁচায় আমার সত্যনিষ্ঠা।

ইংরেজদের সঙ্গে সম্পর্ক হবার পর আমাকে আবার গীতা পড়তে হ'ল। "পড়তে হ'ল" এ জন্য বলছি যে, বইটি পড়ার কোন তীব্র বাসনা ছিল না। কিন্তু যখন এই দুই ভাই আমার সঙ্গে গীতা পড়তে চাইলেন, বড় লজ্জা হ'ল। স্বীয় ধর্ম-শাস্ত্র বিষয়ে কোন জ্ঞান নেই মনে করে দুঃখও হ'ল। মনে হয়, দুঃখের কারণ ছিল অভিমান। আমার এতটা সংস্কৃত জ্ঞান ছিল না, যে কারো সাহায্য ছাড়াই সব শ্লোকের অর্থ যথাযথ বুঝব। এ দুই ভাই তো কিছুই বুঝতেন না। ওঁরা আমাকে দিলেন, সার এডুইন আর্নল্ড কৃত শ্রীগীতা-য় উৎকৃষ্ট কাব্যানুবাদ। দ্রুত পড়ে ফেললাম বইটি, চমৎকৃত হয়ে গেলাম। সেদিন থেকে আজ অবধি, শেষের 19-টি শ্লোক আমার হৃদয়ে ক্ষোদিত রয়ে গেছে। আমার বিশ্বাসে, সকল ধর্ম ওতেই সংকলিত আছে।

ওতে আছে সম্পূর্ণ জ্ঞান, ওর সিদ্ধান্ত অচল। বুদ্ধির সম্পূর্ণ প্রয়োগও আছে, তবে তা সংস্কারকারী বুদ্ধি। ওতে অনুভব-জ্ঞানও আছে।

প্রথম পরিচয়ের পর আমি অনেক অনুবাদ, ও টীকা পড়েছি। বহু তর্ক করেছি ও শুনেছি। প্রথম বার পড়ার পর মনে যে ছাপ পড়ে, তা রয়ে গেছে। এ শ্লোক শ্রীগীতাকে বুঝবার চাবিকাঠি। তার বিরোধী অর্থবহ ব্যাখ্যা যদি মেলে, আমি

বলব তা বর্জন করো। নম্র আর বিনয়ী লোকদের অন্যার্থ বর্জনের দরকার পড়বে না। তারা বলবে, দ্বিতীয় শ্লোক এটির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়? তবে তা আমার বোঝার ভুল। সময় কাটুক। এক সঙ্গে শেষের উনিশটি শ্লোক মিলে-মিশেই থাকবে। তারা নিশ্চিন্ত হবে এ কথা নিজেকে ও অপরকে বলে।

শাস্ত্র ব্যাখ্যার কাজে সংস্কার ও উপলব্ধি আবশ্যকীয়। "শূদ্রের বেদাধ্যয়নের অধিকার নেই" কথাটি সম্পূর্ণ ভুল নয়। এখানে সংস্কারহীন, মূর্খ ও অজ্ঞানীই শূদ্র। এমন লোকরা বেদাধ্যয়ন করে বেদের অনর্থ ঘটাবে। বয়স হয়েছে, এমন সব লোকই বীজগণিতের কঠিন প্রশ্ন বোঝার অধিকারী নয়। তা বোঝার আগে কিছু প্রারম্ভিক শিক্ষা দরকার। ব্যাভিচারীর মুখে "অহং ব্রহ্মাস্মি" কি মানায়? ব্যাভিচারী ওই বাক্যের কি অর্থ (বা অনর্থ) করবে?

অর্থাৎ শাস্ত্র ব্যাখ্যাকারীকে সংযম পালন করতে হয়। শুষ্ক সংযম পালন কঠিন ও নিরর্থক। শাস্ত্রে বলা হয়েছে, গুরু থাকা অত্যাবশ্যক। কিন্তু এখন তো তেমন গুরু বিরল। এ জন্য জ্ঞানীলোকেরা ভক্তিপ্রধান গ্রন্থ পড়তে শিক্ষা দেন। যার ভক্তি ও শ্রদ্ধা নেই, সে শাস্ত্র ব্যাখ্যার অধিকারী নয়। বিদ্বানরা শাস্ত্র থেকে বিদ্যাবত্তাপূর্ণ ব্যাখ্যা করতে পারেন, তা শাস্ত্র ব্যাখ্যা হবে না। অনুভব করেন যিনি, তিনিই শাস্ত্রের অর্থ ব্যক্ত করতে পারেন।

সাধারণ মানুষের জন্যও তো কিছু ব্যবস্থা আছে। শাস্ত্রের সেই ব্যাখ্যা, যা সত্য বিরোধী, তা সঠিক নয়। সত্যকে যে ভয় পায়, তার জন্য শাস্ত্র নয়। তার ক্ষেত্রে সব শাস্ত্রই অশাস্ত্র। তাদের শাস্ত্র সমাধানের শক্তি নেই। ভয় তার হবে, যে শাস্ত্রে অহিংসা দেখে না। তার উদ্ধার হবে না, তা নয়। সত্য স্বীকারাত্মক, অহিংসা নিষেধাত্মক। যা হওয়া কাম্য, সত্য তেমন জিনিসের সাক্ষ্য দেয়। (বাহ্যত)যা আছে,,অহিংসা তাকে নিষেধ করে। সত্য আছে, অসত্য নেই, হিংসা আছে, অহিংসা নেই। তবু অহিংসাই চাই, তা পরম ধর্ম। সত্য তো স্বয়ংসিদ্ধ। অহিংসা তারই "সম্পূর্ণ পরিণতি"। তা সত্যের মধ্যেই লুকিয়ে আছে। অহিংসা সত্যের মতো ব্যক্ত নয়। তা না মেনে মানুষ শাস্ত্রকে যত বাধা দিক, শেষ অবধি সত্য তাকে অহিংসার পাঠই পড়াবে।

সত্যের জন্য তপশ্চর্যা করতে হয়। সত্যদ্রষ্টা তপস্বীরা চারিদিকে ব্যাপ্ত হিংসার মধ্যে অহিংসা দেবীকে পৃথিবীর সামনে তুলে ধরে বলেছেন : হিংসা মিথ্যা, মায়া। অহিংসাই সত্য বস্তু। ব্রহ্মচর্য, অস্তেয়, অপরিগ্রহ, সবই অহিংসার জন্য। এগুলি অহিংসাকে সফল করবার শক্তি বিশেষ। অহিংসাই সত্যের প্রাণ। তা না

হ'লে মানুষ পশুর সমান। সত্যার্থী, নিজেকে শোধন করার জন্য যত্ন নেন, এবং এ কথা দ্রুত বুঝে যান। শাস্ত্র ব্যাখ্যা করতে তাঁর কোন মুশকিল হয় না।

শাস্ত্র ব্যাখ্যা করার দ্বিতীয় নিয়ম হ'ল, শব্দ মাত্রকে ধরে বসে থাকলে হবে না। শব্দের ধ্বনি ও মর্মকে বুঝতে হবে। তুলসীদাসজীর "রামায়ণ" উত্তম বই। কেন না স্বচ্ছতা, দয়া ও ভক্তিই তার ধ্বনি। তাতে লেখা আছে, "শূদ্র, মূর্খ, ঢোল (বাদ্যযন্ত্র) ও নারী, এদের পিটাতে হবে।" এ পড়ে যদি কোন পুরুষ নিজ স্ত্রীকে পেটে, তার অধোগতি হবে। রামচন্দ্র সীতাকে কখনো পেটান নি, দুঃখও দেন নি। তুলসীদাস একটি প্রচলিত প্রবাদ বাক্য লিখেছিলেন মাত্র। ঐ কথা স্বপ্নেও ভাবেন নি যে এই বাক্যের ভিত্তিতে, আপন স্ত্রীকে প্রহারকারী পশুও একদিন আত্মপ্রকাশ করতে পারে। স্বয়ং তুলসীদাসও যদি দেশাচার মেনে নিজ পত্নীকে পিটিয়ে থাকেন, তাতেই বা কি? প্রহার করা অবশ্যই খারাপ। 'রামায়ণ পত্নীকে তাড়না করার জন্য লেখা হয় নি। তা লেখা হয়েছে, পূর্ণ পুরুষকে দেখাবার জন্য, সতী শিরোমণি সীতাকে দেখাবার জন্য। ভরতের আদর্শ ভক্তির নানা পরিচয় দেবার জন্য। জঘন্য দেশাচারের যে সমর্থন ওতে মেলে, তা বর্জনীয়। ভূগোল শেখাবার জন্য তুলসীদাস স্বীয় অমূল্য গ্রন্থ লেখেন নি। ও বইয়ে ভূগোলের গোলমাল পেলে তা না-মানাই উচিত।

শ্রীগীতা-র কথা বলি। ব্রহ্মজ্ঞানের সাধনা ও প্রাপ্তি শ্রীগীতা-র বিষয়বস্তু। দুই পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ, নিমিত্ত মাত্র। বলা যায়. কবি স্বয়ং যুদ্ধবিরোধী ছিলেন না, তাই যুদ্ধের ব্যাপারটিকে এ ভাবে কাজে লাগিয়েছেন। কিন্তু মহাভারত পড়ার পর আমার মনে ভিন্ন উপলব্ধি জাগল। ব্যাস, এত চমৎকার বই লিখে যুদ্ধের অসারত্বই বুঝিয়েছেন। কৌরব হারলেই বা কি, আর পাণ্ডব জিতলেই বা কি? কতজন বিজেতা বাঁচলেন? তাঁদের কি হ'ল? জননী কুন্তীর কি হ'ল? আজ যাদব কুল কোথায়?

যেখানে যুদ্ধ বর্ণনা ও হিংসার প্রতিপাদন মুখ্য বিষয়ই নয়, সেখানে ওইগুলির ওপরেই জোর দেওয়া অনুচিত। যদি কিছু শ্লোকের সঙ্গে অহিংসাকে চিহ্নিত করা মুশকিল হয়,—তাহ'লে সমগ্র শ্রীগীতাকে হিংসার প্রবক্তা প্রমাণ করা আরো কঠিন।

কোন গ্রন্থ রচনা কালে কবি তার সব অর্থ কল্পনায় রাখেন না। কাব্যের জয় এখানে, তা কবিকে পিছে ফেলে যায়। যে সত্যকে কবি তন্ময় চিত্তে বাণীরূপ দেন, তার কত ব্যাখ্যা হতে পারে, তা তিনি জানেন না। তাই বহু কবির কাব্য এবং

বাস্তবজীবন হয়তো মেলে না। সব মিলিয়ে শ্রীগীতা-র তাৎপর্য হিংসা নয়, অহিংসা। দ্বিতীয় অধ্যায় এ প্রসঙ্গের সূচনা, পূর্ণাহুতি 18 অধ্যায়ে। এগুলি দেখলেই আমার কথা বিশ্বাস হবে। মধ্যভাগেও তো তাই প্রমাণ হয়। ক্রোধ-রাগ-দ্বেষ ব্যতিরেকে হিংসা হওয়া অসম্ভব। গীতা ক্রোধ ইত্যাদি অতিক্রম করে গুণাতীতের কাছে পৌঁছবার চেষ্টা করে। গুণাতীত ব্রহ্মে ক্রোধের স্থান নেই। অর্জুন আকর্ণ জ্যা টানেন যখন, তাঁর রক্তাভ চোখে তা আজও দেখতে পাই।

অহিংসার জন্য যুদ্ধ বর্জনের চেষ্টা কবে করলেন অর্জুন? তিনি তো অনেক যুদ্ধ করেছেন। তখন তিনি মাহাবিবশ। তাই স্বীয় আপনজনদের মারতে চান নি। যাকে পাপী মনে করতেন, তাকে মারার কথায় অর্জুন কি বললেন? শ্রীকৃষ্ণ তো অন্তর্যামী। অর্জুনের ক্ষণিক মোহ উপলব্ধি করে তিনি বললেন, "তুমি তো হিংসার পথে গিয়েছ। এখন বোদ্ধা সাজার দম্ভ করলে তুমি অহিংসা শিখবে না। তাই যে কাজ শুরু করেছ, তা সমাপ্ত করতেই হবে।" ঘণ্টায় চল্লিশ মাইল গামী রেলগাড়িতে ভ্রমণকারী একের পর এক বিদেশ দেখে বিরক্ত হয়ে চলন্ত ট্রেন থেকে লাফ মারে, সবাই বলবে, ও আত্মহত্যা করেছে। প্রবাস যাত্রা বা রেল ভ্রমণের অসারত্ব সে ব্যক্তি শেখে নি। অর্জুনের অবস্থাও তেমনি হয়েছিল। অহিংস কৃষ্ণ, অর্জুনকে অন্য উপদেশ দিতে পারতেন না। তার অর্থ এই নয় যে শ্রীগীতা হিংসাকেই সমর্থন করেছে। দেহরক্ষার জন্য কিছু হিংসা অনিবার্য, অতএব হিংসা ও ধর্ম সমার্থক, এ কথা বলা যেমন অনুচিত, শ্রীগীতা-র বেলাও তাই। সূক্ষ্মদর্শী যে, সে এই হিংসাময় শরীর থেকে অশরীরী হবার, অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্তির ধর্ম শেখায়।

কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র কে ছিলেন? দুর্যোধন যুধিষ্ঠির আর অর্জুনই বা কে? কৃষ্ণ কে? এঁরা কি ইতিহাসের মানুষ? হঠাৎ অর্জুন সওয়াল করেন, আর কৃষ্ণ শ্রীগীতা শোনান। আর অর্জুন, যাঁর মোহ নাশ ঘটেছে, তিনি সওয়াল করেও তা ভুলে যান, কৃষ্ণকে দ্বিতীয়বার অনুগীতা বলতে হয়।

আমি দুর্যোধনদের আসুরবৃত্তি সম্পন্ন এবং অর্জুনদের দৈবীবৃত্তি সম্পন্ন মনে করি। এ শরীরও ধর্মক্ষেত্র। এতে দ্বন্দ্ব চলতেই থাকে, অনুভাবী, ঋষি, কবি, সে দ্বন্দ্বের বর্ণনা করেন। কৃষ্ণ অন্তর্যামী। শুদ্ধ চিত্তে ঘড়ির শব্দের মত স্পন্দিত হন। চিত্তকে শুদ্ধিরূপী চাবি না দিলে,—অন্তর্যামী যদিও চিত্তেই আছেন, তাঁর ঠিকানা তো হারিয়ে যায়।

এ কাথা বলার উদ্দেশ্য এই নয়, স্থূল যুদ্ধের অবকাশ নেই। যে অহিংসা

বোঝে না, তাকে এটাও শোখানো হয় নি, যে কাঁপুরুষ হও। যে ভয় পায়, সঞ্চয় করে, বিষয় চিন্তায় ডুবে থাকে, তাকে তো সহিংস যুদ্ধ করতেই হবে। কিন্তু তার তো সেটা ধর্ম নয়। ধর্ম তো একটাই। অহিংসা মানলে মোক্ষ, মোক্ষ মানে সত্যনারায়ণের প্রত্যক্ষ দর্শন। এতে বিজ্ঞানের স্থান নেই। এ বিচিত্র সংসারে হিংসা তো থাকবেই। তা থেকে বাঁচার পথ গীতা দেখায়। আবার গীতা এও বলে, কাপুরুষের মতো পালালে হিংসা থেকে বাঁচা যায় না। যে পালাবার কথা ভাবে,—সে মারে, অথবা মরে।

প্রশ্নকর্তা যে সব শ্লোকের উল্লেখ করেছেন, তার রহস্য যদি এখনো বোধগম্য না হয়, সেটা আমার ব্যর্থতা। সর্বশক্তিমান ঈশ্বরই কর্তা, ভর্তা আর সংহর্তা। তাঁর তেমনই হওয়া উচিত। এ বিষয়ে কোনো শংকার জায়গা নেই। যিনি সৃষ্টি করেন, বিনাশের অধিকারও তাঁরই হাতে থাকে। কিন্তু তিনি কাউকে মারেন না। যে জন্মায়, সে মরবে বলেই জন্মায়। ঈশ্বরও এ নিয়ম ভাঙেন না। এ তো তাঁর দয়া। স্বয়ং ঈশ্বর যদি নির্বাধ স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠেন, তবে আমরা যাই কোথায়?

ইয়ং ইণ্ডিয়া, 12 নভেম্বর 1925

27

ভাষণ : আরসিকেরে জনসভায়

আমরা জানি না কৃষ্ণজীবনকথা আমাদের কি বার্তা শোনায়। আমরা গীতা পড়ি না। আমাদের সন্তানদের গীতা পড়াতে চেষ্টা করি না। গীতা এমনই এক দিব্য গ্রন্থ, যা সকল ধর্মমতে বিশ্বাসী সব মানুষ, সারা দেশের সমস্ত স্তরের লোক শ্রদ্ধাসহকারে পড়তে পারেন। এবং স্ব-স্ব ধর্মের মর্মবাণী তা থেকে পেতে পারেন। প্রতি জন্মাষ্টমীর দিন আমরা যদি কৃষ্ণের ধ্যান করি, ও গীতা পড়ি, তার শিক্ষা মতে চলবার সংকল্প করি, তাহ'লে আজ আমাদের অবস্থা যেমন শোচনীয়, তা হয় না। শ্রীকৃষ্ণ জীবনভর জনতার সেবা করেছেন। তিনি জনতার সাচ্চা সেবক ছিলেন। কুরুক্ষেত্রে সেনা-পরিচালনাও করতে পারতেন, তবু অর্জুনের সারথি হতেই চেয়েছিলেন। তাঁর সমগ্র জীবন, এক অবিচ্ছিন্ন "কর্মের গীতা।" দর্পিত দুর্যোধন প্রেরিত মিষ্টান্ন অবহেলায় প্রত্যাখ্যান করে তিনি বিদুরের বিনম্রচিত্ত আয়োজন শাকান্ন খেয়েছিলেন। বালক কৃষ্ণ গরু চরাতেন। আজও আমরা তাঁকে "গোপাল" নামে স্মরণ করি। কিন্তু তাঁর উপাসক আমরা, আজ গরুকে নিষ্ঠুর উপেক্ষা করি। আদি কর্ণাটকের লোক গো-বধ করে, গো-মাংস খায়। এ জন্য আমাদের শিশুরা অসুখ হলেও গরুর দুধ পায় না। কৃষ্ণের জীবনে নিদ্রা বা আলস্য ছিল না। বিশ্বের ওপর তাঁর দৃষ্টি সদাজাগরূক থাকত। তাঁর বংশজ আমরা ক্ষীণশক্তি, হাতে কাজ করতে একেবারে ভুলে গেছি। ভগবান কৃষ্ণ ভাগবদ্‌গীতায় আমাদের ভক্তিমার্গ দেখিয়েছেন। তা কর্ম-মার্গও বটে। লোকমান্য

তিলক বলেছেন, আমরা ভক্ত, বা জ্ঞানী, যা হতেই চাই না কেন,—তার পথ হ'ল কর্ম। তবে সম্বার্থ কাজ নয়, পরমার্থের জন্য কর্ম চাই। স্বার্থপ্রসূত কর্ম, ব্যক্তিটির বন্ধন হয়ে ওঠে। পরমার্থের জন্য যে কাজ করা হয়, তা বন্ধন থেকে মুক্ত করে। এমন কোন নিঃস্বার্থ কাজ আছে, যা হিন্দু-মুসলমান-খ্রিষ্টান, স্ত্রী-পুরুষ ও বালক-বালিকা সবাই সমভাবে করতে পারে? আমি ভেবেছি, এ কর্মযজ্ঞ হতে পারে চরকায় সুতো কাটা। এ সেই কাজ, যা ঈশ্বরের নাম নিয়ে গরীবের জন্য করা যায়। জনতার দুর্বলতর অংশকে সক্রিয় করা যায়। ভগবান কৃষ্ণ এও লিখেছেন, যদি প্রকৃত ভক্ত হতেই হয়, তবে ব্রাহ্মণে-মেথরে ভেদাভেদ করলে চলবে না। যদি তা সত্য হয়, তবে হিন্দুধর্মে অস্পৃশ্যতার ঠাঁই থাকতে পারে না। আজ জন্মাষ্টমীর পবিত্র দিনে এটা ত্যাগ করে আত্ম-শুদ্ধি করা উচিত। গীতা-র প্রতি যথার্থ নিষ্ঠাবান কোন লোক, হিন্দু ও মুসলমানে ভেদ করবে না। কেননা ভগবান কৃষ্ণ বলেছেন, যে কেউ যে কোন নামে ঈশ্বরের উপাসনা করুক,— উপাসনা যদি নিখাদ হয়, তবে তা তাঁরই উপাসনা। গীতা-তে প্রতিপাদিত ভক্তি-কর্ম ও প্রেমের মার্গে মানুষকে ঘৃণা করার কোন জায়গা নেই।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, 1 সেপ্টেম্বর 1927

28

অনাসক্তিযোগ

এখন গীতার অর্থে প্রবেশ করছি।

1888-1889 সালে যখন গীতার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটে, মনে হয়েছিল, গীতা ঐতিহাসিক বই নয়। এতে বাস্তব যুদ্ধের বর্ণনাকে উপলক্ষ করে মানবহৃদয়ে নিরন্তর চলমান দ্বন্দ্বযুদ্ধের বর্ণনা করা হয়েছে। মানবযোদ্ধার রচনাকে হৃদয়ে রসগ্রাহী করে তোলার কল্পনা মাত্র এটি। গীতা আর ধর্ম দুই নিয়ে অনেক ভাবার পর মনের সেই প্রথম জাগরণে লব্ধ প্রেরণা স্থায়ী হয়ে গেল। মহাভারত পড়ার পর এ ধারণা দৃঢ়তর হল। আধুনিক অর্থে মহাভারতকে ইতিহাস বলে মানা হয় না। আদিপর্বেই এর বলিষ্ঠ প্রমাণ আছে। চরিত্রগুলির অমানুষী আর অতিমানুষী উৎপত্তি বর্ণনা করে ব্যাস "ভগবান" রাজা ও প্রজার ইতিহাসে দাঁড়ি টেনে দিয়েছেন। মহাভারতে বর্ণিত চরিত্র মূলত ঐতিহাসিক হতেও পারে। কিন্তু ব্যাস ভগবান, ধর্মকে দেখাবার জন্যই ওদের ব্যবহার করেছেন।

মহাভারতকার বাস্তব যুদ্ধের আবশ্যকতা প্রমাণ করেন না। তার নিরর্থকতাই প্রমাণ করেন। উনি বিজয়ীদের কাঁদিয়েছেন, উত্তর-অনুশোচনা করিয়েছেন,—তাদের কপালে দুঃখ ছাড়া কিছু লেখেন নি।

এই মহাগ্রন্থ মহাভারতে গীতার স্থান সর্বোচ্চে। তার দ্বিতীয় অধ্যায়, বাস্তব যুদ্ধের পদ্ধতি শেখাবার বদলে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ শেখায়। স্থিতপ্রজ্ঞের পার্থিব যুদ্ধের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ থাকতে পারে না। এ তো আমি স্থিতপ্রজ্ঞের বৈশিষ্ট্যগুলির

মধ্যে নিহিত আছে বলেই দেখি। পরিবারের মামুলী ঝগড়ার ঔচিত্য বা অনৌচিত্য নির্ণয় করতে গীতা-র মত বই লেখা হয় না।

গীতা-র কৃষ্ণ মূর্তিমান শুদ্ধ সম্পূর্ণ জ্ঞান। তিনি কাল্পনিক। কিন্তু তার জন্য আমার উদ্দেশ্য কৃষ্ণ নামধারী অবতারকে বাতিল করা নয়। আমি এটুকুই বলব, পরিপূর্ণ কৃষ্ণ কল্পনাসৃষ্টা পরে ওঁকে সম্পূর্ণ অবতার করা হয়েছে।

অবতারের অর্থ, শরীরধারী বিশিষ্ট পুরুষ। জীবমাত্রেই ঈশ্বরের অবতার। তবে লৌকিক ভাষায় আমরা সকলকে অবতার বলি না। যে পুরুষ স্বীয় সময়কালে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ধর্মবান পুরুষ হন,— ভবিষ্যতের মানুষ তাঁকেই অবতাররূপে পূজা করে। এতে আমি কোন দোষ দেখি না। এতে ঈশ্বরের মাহিমা লাঘব হয় না, সত্যেও আঘাত লাগে না।..."আদম খুদা নয়। কিন্তু খুদার জ্যোতি থেকে আদম দূরে নয়।" যে পুরুষের মধ্যে তাঁর যুগে সর্বাধিক ধর্ম-জাগরণ ঘটে, তাঁকেই বিশেষ অবতার বলে মানা হয়। এমন বিচারে আজ হিন্দুধর্মে কৃষ্ণরূপী পরিপূর্ণ অবতার চক্রবর্তী সম্রাট।

অবতারে এমন বিশ্বাস, মানুষের অন্তিম, উদাত্ত, আধ্যাত্মিক অভিলাষের লক্ষণ। ঈশ্বর-রূপধারণ না করলে মানুষের সুখ মেলে না। শান্তি পায় না সে। ঈশ্বর-রূপ হয়ে ওঠার জন্য প্রযত্নের নাম সত্য এবং একমাত্র পুরুষার্থ, তা আত্মদর্শনও বটে। এ আত্মদর্শন যেমন অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের, তেমন গীতারও বিষয়। তবে গীতাকার, এ বিষয় প্রতিপন্ন করার জন্য গীতা লেখেন নি। গীতার উদ্দেশ্য,—আত্মার্থীকে আত্মদর্শন করাবার এক উপায় বলে দেওয়া। যে কথা হিন্দু ধর্মগ্রন্থ সমূহে এখানে ওখানে বিক্ষিপ্ত দেখি, তাকেই গীতা অনেক রূপে, অনেক শব্দে, পুনরুক্তি করওে চমৎকার ভাবে স্থাপিত করেছেন। সেই অদ্বিতীয় উপায় হল, কর্মফল ত্যাগ।

এই কেন্দ্রবিন্দু থেকেই গীতার সমগ্র বিষয়টি বিকশিত হয়েছে, গেঁথে তোলা হয়েছে। ভক্তি, জ্ঞান, ইত্যাদি এ কেন্দ্রবিন্দু ঘিরে তারামণ্ডলের মত আপনাপন জায়গা খুঁজে নিয়েছে। দেহ থাকলে কর্মও আছে। কর্ম থেকে কোন মানুষই মুক্ত নয়। তবু সকল ধর্ম এটাই প্রতিপন্ন করেছে যে, দেহকে ঈশ্বরের মন্দির বানালে তার দ্বারাই মুক্তি মেলে। কিন্তু প্রতি কর্মে কোন-না কোন দোষ তো থাকেই। মুক্তি মেলে শুধু নির্দোষ মানুষের। তবে কর্মের বন্ধন থেকে দোষের স্পর্শ থেকে কেমন করে ছাড়া মেলে? এ প্রশ্নের উত্তর গীতা নিঃসংশয় শব্দে দিয়েছে : "নিষ্কাম কর্ম করে; যাতার্থ কর্ম করে; কর্মের ফল ত্যাগ করে; সকল কর্ম

কৃষ্ণকে অর্পণ করে,—অর্থাৎ মন, বচন, ও কায়া দিয়ে ঈশ্বরের হোম করো।”

কিন্তু নিষ্কামতা, কর্মফল ত্যাগের কথা শুধু বললেই তো আর করা হয়ে যায় না। ও কাজ শুধু বুদ্ধি প্রয়োগ করে করা যায় না। হৃদয়-মন্থন থেকেই তা উৎসারিত হয়। এই ত্যাগ-শক্তি জাগাবার জন্য জ্ঞান আবশ্যক। এক ধরনের জ্ঞান অনেক পণ্ডিত অর্জন করেন। বেদাদি তাঁদের কণ্ঠাগ্রে থাকে। কিন্তু ওঁদের মধ্যে অনেকে ভোগে-রাগে নিমজ্জিত থাকেন। জ্ঞানের আতিশয্য যেন শুষ্ক পাণ্ডিত্যের রূপ না ধরে, তা মাথায় রেখে গীতাকার জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তিকেও মিলিয়েছেন। ভক্তিকে দিয়েছেন প্রথম স্থান। ভক্তি-রহিত জ্ঞান, বিকৃত রূপ ধরতে পারে। তাই তিনি বলেছেন, “ভক্তি করো, জ্ঞান পাবে।” ভক্তি তো “মাথায় রাখার ভূষণ।” ভক্তের লক্ষণ, স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণের অনুরূপ, এই বলেছেন গীতকার।

তাই গীতায় ভক্তি কোন পাগলামি বা অন্ধ শ্রদ্ধা নয়। গীতায় বলেছে, বাইরের চেষ্টা বা ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে ভক্তির সম্বন্ধ খুব কম। মালা, তিলক, আদি ভক্ত ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু তা ভক্তির লক্ষণ নয়। সেই ভক্ত,—যে দ্বেষমুক্ত, করুণা ভাণ্ডার, অহং ও মায়াবন্ধন মুক্ত, তার কাছে শীত-গ্রীষ্ম বা সুখ-দুঃখ সমান, সে ক্ষমাশীল এবং সদাপ্রসন্ন তার প্রত্যয় অবিচল, সে স্বীয় মন ও বুদ্ধি ঈশ্বরে সমর্পণ করেছে, সে কাউকে ত্রস্ত করে না এবং কাউকে ভয় পায় না,—যে হর্ষ-শোক-ভয় ইত্যাদি থেকে মুক্ত, পবিত্র, কর্মদক্ষ হয়েও তটস্থ থাকে, শুভাশুভকে ত্যাগ করে, শত্রু ও মিত্রকে সমদৃষ্টে দেখে, যার চোখে মান ও অপমান সমান, প্রশংসায় সে স্ফীত হয়না, নিন্দায় হয় না ক্লিষ্ট,—যে মৌনী, যার প্রিয় হ'ল নির্জনতা, স্থির বুদ্ধি যার,—সেই ভক্ত। যে স্ত্রী ও পুরুষ আসক্তির দাস, তাদের পক্ষে এমন ভক্তি সম্ভব নয়।

এ থেকে দেখি, জ্ঞান লাভ করা, ভক্ত হওয়া, তাই আত্মদর্শন। আত্মদর্শন এ থেকে ভিন্ন কিছু নয়। যে টাকা খরচ করে হয় বিষ বা নয় অমৃতসমান কোন বস্তু কেনা যায়,—তেমনিই জ্ঞান বা ভক্তির মূল্যে বন্ধনও পেতে পারো, অথবা মোক্ষ,—তেমন কথা বলছি না। সাধন ও সাধ্য যদি সম্পূর্ণ এক নাও হয়, তবু প্রায় একই। সাধনের পরাকাষ্ঠা মোক্ষ। গীতার মোক্ষ পরম-শান্তি।

কিন্তু এমন জ্ঞান আর এমন ভক্তির কর্মফল ত্যাগ করার কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। সাধারণ লোকের কল্পনায় শুষ্ক পণ্ডিতও জ্ঞানী বলে মাননীয়। অমন জ্ঞানীর কোন কাজ করার দরকার নেই। একটি ঘটিকে ওঠানাও তাঁর কাছে

কর্মবন্ধনের কারণ। যজ্ঞশূন্য মানুষ যেখানে জ্ঞানী বলে মানিত, সেখানে ঘটি ওঠানোর মত তুচ্ছ হাতের কাজ কেমন করে সম্ভব?

সাধারণ লোকের কল্পনায় সেই ভক্ত, যে ভক্তির জন্য বাউরা হয়ে যায়,—মালা হাতে ভগবানের নাম জপে,—মালা ফেরাতে বাধা পড়বে বলে সেবার কাজ করে না,—এ লোক স্নানাহার কালে মালা নামিয়ে রাখে। তবে চাকি পেষাই, বা রোগের সেবা, বা চাকরি করার জন্য মালা হাত থেকে নামায় না। এমন জ্ঞানী ও এমন ভক্তদের বিষয়ে গীতা স্পষ্ট বলেছে : "কর্ম বিনা কারো সিদ্ধিলাভ ঘটেনি। জনক ইত্যাদিও কর্ম বলে জ্ঞানী হল। আমি যদি আলস্য ছেড়ে কাজ না করি, এ সব সাধারণ মানুষ বিনাশপ্রাপ্ত হবে।" এর পরেও কি সামান্য মানুষদের কথা শুধাতে হবে?

তবে একদিকে এ কথা সত্যি যে, কর্মমাত্রেই বন্ধন। অন্যদিকে, মানুষ ইচ্ছায় হোক, বা অনিচ্ছায়, কাজ করে। শরীর বা মনের প্রতিটি চেষ্টাই কর্ম। তবে কর্মরত মানুষ কেমন করে বন্ধন মুক্ত থাকতে পারে? আমি যতদূর জানি, এ সমস্যার সমাধান গীতায় যেমন আছে, অন্য কোন ধর্মগ্রন্থে তা নেই। গীতা বলছে : "ফলের আশা ছেড়ে কর্ম করো।" "আশা-রহিত হয়ে কর্ম করো।" গীতার এমন কথা ভুলতে পারি না। যে মানুষ কর্ম ছেড়ে দেয়, সে অধঃপাতে যায়। কর্মরত থেকেও যে ফলের আশা করে না, সে ওপরে ওঠে।

ফলত্যাগের অর্থ এই নয় যে, কর্মের পরিণাম বিষয়ে পরোয়া করবে না। পরিণাম আর সাধনের বিচার করা, দুই বিষয়েই জ্ঞান হওয়া খুবই দরকার। এ সব করার পর যে লোক পরিণামের বাসনা ত্যাগ করে কর্মসাধনে ডুবে থাকে, তাকে ফলত্যাগী বলা যায়।

ত্যাগীর কর্মফল মেলে না,—ফলত্যাগের এমন অর্থ যেন কেউ না করে। গীতায় এমন অর্থের কোন জায়গা নেই। ফলত্যাগের অর্থ, ফলের বিষয়ে আসক্তির অভাব। বাস্তবে ফলত্যাগীর হাজারগুণ ফল মেলে। গীতা নির্দেশিত ফলত্যাগে মানুষের অনন্ত শ্রদ্ধার পরীক্ষা আছে। যে ব্যক্তি পরিণামের কথা ভাবে, সে বেশি করে কর্ম ও কর্তব্য ভ্রষ্ট হয়ে পড়ে। সে ধৈর্য হারায়, তাই ক্রোধের বশীভূত হয়ে পড়ে এবং পরে অকরণীয় কাজ করতে থাকে। এক ছেড়ে দ্বিতীয়, তারপর তৃতীয়, কাজ হতে কাজে ভেসে বেড়ায়। কর্মের পরিণাম চিন্তা করে যে, সে বিষয়লোভে অন্ধ মানুষের সমান। শেষ অবধি বিষয়ী মানুষের মতই ভাল-মন্দ, নীতি-নীতিহীনতা, এ সব চিন্তা মন থেকে মুছে ফেলে।

কাজের ফল, যেনতেন উপায়ে পেতে চেষ্টা করে,—সেটাকেই ধর্ম বলে মানতে থাকে।

কর্মের ফলে আসক্তির এই কঠোর পরিণাম থেকেই কিন্তু অনাসক্তি বা ফলের আশা ত্যাগ করে কর্ম করার ব্যাপারটা বের করে নিয়েছেন গীতাকার। খুব আকর্ষণীয় ভাষায় তা লিখেছেন।

এটা তো সবাই জানে যে ধর্ম আর অর্থ পরস্পরবিরোধী। "ব্যবসা ইত্যাদি সাংসারিক কাজ কর্মের মধ্যে ধর্ম পালন করা যায় না, ধর্মের ঠাঁই নেই সেখানে। শুধু মোক্ষ লাভের জন্য ধর্ম সাধনা করা যায়। ধর্ম, ধর্মের স্ব-স্থানে শোভা পায়,—অর্থসম্পদ তার স্ব-স্থানে।" স্বীকার করি, গীতাকার আমাদের ভ্রম দূর করেছেন। তিনি মোক্ষ এবং সাংসারিক কর্মের মধ্যে এমন কোন ভেদ রাখেন নি। কিন্তু ধর্মকে ব্যবহার ও আচরণের স্তরে নামিয়েছেন। যে ধর্ম, আচরণে প্রকাশ পায় না তা ধর্ম নয়। গীতাও তাই বলে, আমারও তাই মনে হয়। গীতার মতানুসারে নিরাসক্ত মনে যে কাজ করা যায় না, তা ত্যাগযোগ্য। এই চমৎকার নিয়ম মানুষকে অনেক ধর্মসংকটে বাঁচায়। এ মতানুসারে হত্যা, মিথ্যাচার, ব্যাভিচার, ইত্যাদি স্বভাব থেকে ত্যাক্ত হয়। তাতে মানব জীবন সহজ সরল হয়, তাতে শান্তি সূচিত হয়।

এ সব নিয়মাবলী অনুসরণ করতে গিয়ে আমার মনে হয়, শ্রীগীতা-র শিক্ষার অনুসরণকারী মানুষের সত্য ও অহিংসা স্বভাবে উপজাত করা দরকার। যার কর্মফলে আসক্তি নেই, তার মিথ্যা ভাষণের বা হিংসাশ্রয়ী কাজ করার প্রবৃত্তি হবে না। হিংসা বা অসত্য আশ্রয়ীদের যে কোন কাজ পরীক্ষা করলেই দেখা যাবে, তার পিছনে আছে কোন লোভনীয় ফল পাবার ইচ্ছা।

তবে অহিংসার প্রতিপাদন করা গীতার লক্ষ্য নয়। গীতার অনেক আগে থেকেই অহিংসা পরম ধর্ম বলে মানিত হত। গীতার লক্ষ্য অনাসক্তির ঔৎকর্ষ প্রতিপাদন। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে এ কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

তবে গীতা যদি অহিংসাকে জেনে নিয়ে থাকে, অথবা অনাসক্তির মধ্যে অহিংসা স্বভাবতই এসে পড়ে, তবে গীতাকার এক বাস্তব যুদ্ধকে উদাহরণ রূপে বেছে নিলেন কেন? এর উত্তর, গীতার যুগে অহিংসা ধর্ম স্বীকৃতি পেয়েছিল যেমন, তেমনি সে সময়ে যুদ্ধবিগ্রহ খুবই প্রচলিত ছিল। তাই তেমন এক যুদ্ধকে উদাহরণ রূপে গ্রহণ করতে গীতাকারের কোন সংকোচ হয়নি, হওয়া স্বাভাবিকও ছিল না। কিন্তু কর্মফলত্যাগের মাহাত্ম্যের গুরুত্ব দেখাবার সময়ে গীতাকার কি

ভেবেছিলেন, অহিংসার মাহাত্ম্যকে কত উচ্চে রেখেছিলেন, সে বিচারে আমাদের দরকার নেই। কবি এক মহত্ত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত জগতের দরবারে পেশ করেছেন। তিনি সে সিদ্ধান্তের মহত্ত্ব জানেন, অথবা জানার পরে উপযুক্ত ভাষায় তা প্রকাশ করতে পারেন এমন হতে পারে না। এর মধ্যেই কাব্য ও কবির মহিমা নিহিত। কবির কথার অর্থ তো অন্তহীন।

যে ভাবে মানুষের বিকাশ লাভ ঘটে, সে ভাবেই মহাকাব্যের ব্যাখ্যার বিকাশ হতে থাকে। ভাষায় ইতিহাস পরীক্ষা করে দেখি, অনেক মহান শব্দের অর্থ সর্বদা বদলাচ্ছে, ব্যাপ্তি পাচ্ছে। এ কথা গীতা বিষয়েও সত্য। বরং গীতাকার মহান শব্দের অর্থকে বিস্তৃতি দিয়েছেন। গীতাকে ওপর-ওপর পরীক্ষা করলেও তাই দেখি।

গীতার যুগে যজ্ঞে পশুবলির স্থান ছিল সম্মানিত। কিন্তু গীতার যজ্ঞে রক্তের ঘ্রাণ অবধি পাই না। গীতাতে বলা হয়েছে, জপযজ্ঞ সকল যজ্ঞের রাজা। গীতার তৃতীয় অধ্যায় বলছে, যজ্ঞের অর্থ, মুখ্যত পরোপকার কার্যে দেহ নিয়োগ। তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায় মিলিয়ে পড়লে যজ্ঞের অপর ব্যাখ্যাও মিলতে পারে। কিন্তু পশুহিংসার সমর্থন কখনো মিলবে না।

গীতার সন্ন্যাস শব্দের অর্থের বিষয়েও একই কথা। কর্মমাত্রকে ত্যাগ গীতার সন্ন্যাস নায়। গীতার সন্ন্যাসী অতিকর্মী এবং অতি অকর্মী। এ ভাবেই গীতাকার মহান শব্দগুলির ব্যাপক অর্থ করেছেন, তদ্দ্বারা আমাদেরও তাই করতে শিখিয়েছেন। যে মানুষ কর্মফল সম্পূর্ণ ত্যাগ করেছেন, তাঁকে দিয়ে বাস্তবিক যুদ্ধ করানো সম্ভব। এমন ব্যাখ্যা গীতার অক্ষর ও শব্দ থেকে নিঃসৃত হয়। তবে গীতার শিক্ষাকে পূর্ণরূপে ব্যবহারে লাগাবার জন্য 40 বছর চেষ্টা করছি। সবিনয়ে বলি, আমার তো মনে হয় সত্য ও অহিংসা পূর্ণভাবে পালন না করলে মানুষের পক্ষে কর্মফল সম্পূর্ণ ত্যাগ করা অসম্ভব।

গীতা কোন সূত্রগ্রন্থ নয়। এ এক মহান ধর্মকাব্য। আমরা তার যত গভীরে প্রবেশ করব, ততই তা থেকে নতুন ও সুন্দর অর্থ উপলব্ধি করব। গীতা জন-সমাজের জন্য। তাই এতে এক কথাই নানাভাবে বলা হয়েছে। গীতায় ব্যবহৃত কিছু মহান শব্দের অর্থ প্রতি যুগেই বদলাবে এবং ব্যাপকতা পাবে। তবে গীতার মূল-মন্ত্র কখনো বদলাবে না। এ মন্ত্র যে রীতি জীবনে সাধা যায়, সেই রীতির দৃষ্টি থেকে জিজ্ঞাসু মানুষ গীতার মহান শব্দগুলির মনোমত অর্থ করে নিতে পারেন।

গীতা বিধি-নিষেধ (করণীয় বা অকরণীয় কর্ম) নির্দেশক কোন বই নয়। একজনের ক্ষেত্রে যে কাজ বিহিত (করণীয়), তা আরেক জনের পক্ষে নিষিদ্ধ (অকরণীয়) কাজ হতে পারে। একটি কালে বা একটি দেশে যে কাজ বিহিত, তা অন্য কালে, অন্য দেশে নিষিদ্ধ হতে পারে। কেবল কর্মফলে আসক্তিই নিষিদ্ধ, অনাসক্তিই বিহিত।

গীতার জ্ঞানের মহিমা গীত হয়েছে। তবু গীতা বুদ্ধিগ্রাহ্য নয়, হৃদয়গ্রাহ্য। তাই এ বই অশ্রদ্ধাশীল মানুষের জন্য নয়। গীতাকার স্বয়ং বলেছেন :

> যে তপস্বী নয়, ভক্ত নয়, যে শুনতে চায় না, যে আমাকে দ্বেষ করে, তাকে তুমি কখনো এ (জ্ঞান) শুনিও না। যে ব্যক্তি এই পরমগুহ্য জ্ঞান আমার ভক্তদের দেবে, সে আমাকে পরম ভক্তি করার কোন কারণ ব্যাতিরেকেই কোন না কোন ভাবে আমাকে পাবে। তা ছাড়া যে লোক দ্বেষরহিত চিত্তে, শ্রদ্ধায় এ জ্ঞান শুধু শ্রবণ করবে, সেও মুক্ত হয়ে যাবে সেই মঙ্গললোকে, যেখানে পুণ্যবান লোকেদের অধিষ্ঠান।
>
> (অধ্যায় 18: শ্লোক 67, 68, 71)

ইয়ং ইণ্ডিয়া, 6 আগষ্ট 1931

29

ভক্তিযোগ

আমি তো আমার সমস্ত সমস্যার ক্ষেত্রেই দৌড়ই মাতৃরূপী গীতার কাছে। এখনাবধি আশ্বাসই পেয়ে আসছি। অন্যের বেলাও যে তা থেকে আশ্বাসন পেতে ইচ্ছুক,—যে পদ্ধতিতে আমি দিনে দিনে বুঝেছি, সে পদ্ধতি জেনে নিলে কিছু অধিক সাহায্য পাবে। পদ্ধতিটি জানলে গীতা তার কাছে আরও নব-রূপে প্রকাশমান হওয়াও সম্ভব।

আজ দ্বাদশ অধ্যায়ের সার জানাতে চাই। ওটি ভক্তিযোগ। আমি বলি, বিবাহের পর দম্পতিরা পাঁচ যজ্ঞের মধ্যে একেও এক যজ্ঞ হিসেবে মুখস্থ ও চর্চা করুন। ভক্তি বিনা জ্ঞান বা কর্ম নীরস। তা বন্ধন হয়ে ওঠার সম্ভাবনাও আছে। তাই ভক্তিভাবসহ 'গীতা'র এই ধ্যান শুরু করা উচিত।

অর্জুন ভগবানকে জিজ্ঞাসা করলেন : সাকার ও নিরাকার উপাসক ভক্তদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?

ভগবান উত্তর দিলেন : যে আমার সাকার রূপকে শ্রদ্ধাসহ ধ্যান করে তাতে ডুবে যায়, সেই শ্রদ্ধাবান আমার ভক্ত। যে নিরাকার তত্ত্বের উপাসক, উপাসনা কালে সকল ইন্দ্রিয়কে সংযমে রাখে, সর্বজীবে সমভাব রাখে, জীবসেবা করে, কে উচ্চ, কে নীচ, বিচার করে না, সেও আমাকে পায়। তাই বলতে পারি না, দুইয়ের মধ্যে অমুক শ্রেষ্ঠ। তবে নিরাকারে ভক্তি শরীরধারী দ্বারা সম্পূর্ণ রূপে হওয়া অবশ্য দরকার। নিরাকার নির্গুণ এবং মানুষের কল্পনাতীত। সকল মনুষ্য

দেহধারী জন, জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে সাকার ভক্ত। তাই তো তুই আমার সাকার বিশ্বরূপেই মন সঁপেছিস। সব তাকে সঁপে দে। এ কাজ করতে না পারিস, তো চিত্ত বিকার দমন করতে চেষ্টা কর্। মনকে বশ কর্ যম-নিয়ম পালন করে। যথা প্রাণায়াম, আসন, এ সবের সহায়তা নে। তাও না পারিস, তবে যা কিছু করছিস, তা আমার জন্য করছিস, এমনটি ভেবে নিজের সব কাজ কর্। তবে তোর মোহ ও মমতা ক্রমে লয় হতে থাকবে। তুই তিলে তিলে নির্মল শুদ্ধ হতে থাকবি। তোর মধ্যে ভক্তিরস আসবে। এও যদি অসাধ্য হয়, তবে কর্ম মাত্রের ফল ত্যাগ করে দে। কর্মফল লাভের ইচ্ছা ত্যাগ কর্। তোর ভাগে যে কাজটাই পড়ুক, তা করে চল্। কর্মফলের মালিক মানুষ হতেই পারে না। অনেক কিছুর একত্র সমাহারে কর্মফল উপজাত হয়। তুই কেবল নিমিত্ত মাত্র হয়ে যা। যে চার প্রকরণ আমি বললাম, ওর মধ্যে কোনটিকে কম গুরুত্বপূর্ণ মনে করিস না। এর মধ্যে যেটি তোর প্রতি অনুকূল, তা থেকেই ভক্তিরস নিয়ে নে। মনে হয়, আগে যে যম-নিয়ম, প্রাণায়াম, আসন ইত্যাদির পথ বললাম, তার চেয়ে শ্রবণ-মনন, ইত্যাদির জ্ঞান-মার্গ সরল। উপাসনারূপ ধ্যান তার চেয়েও সরল। ধ্যানের চেয়ে কর্মফল ত্যাগ সরল। সকলের ক্ষেত্রে একই বস্তু সরল নয়। আবার কাউকে কাউকে সকল পথেই যেতে হয়। এ তো এ-ওর সঙ্গে মিলেমিশেই আছে। যে পথেই হোক, তোকে ভক্ত হতেই হবে। যে পথে ভক্তি সাধনা করা যায়, সে পথেই সাধনা কর্।

আমি তোকে ভক্তের লক্ষণ বলি—ভক্ত কাউকে দ্বেষ করে না; কারো প্রতি বৈরী ভাব রাখে না; জীব মাত্রের সঙ্গে তার মৈত্রী; জীবমাত্রকে করুণা দেখাবার অভ্যাস করে; এমনটি করবার জন্য মমতা ত্যাগ করে; নিজ সত্তাকে শূন্যত্বে পর্যবসিত করে; দুঃখ ও সুখ তার কাছে সমান। কেউ দোষ করে, সে তাকে ক্ষমা করে (এই জেনে, যে নিজ দোষের জন্য ও সংসারের কাছে ক্ষমা পাবার জন্যও তৃষিত)। সন্তোষিত চিত্ত তার, নিজের শুভ বিনিশ্চিত নিয়ে কখানো বিচলিত নয়। মন ও বুদ্ধিসহ সর্বস্ব আমাকে অর্পণ করে। ওর জন্যে কারো উদ্বিগ্ন হওয়ার দরকার নেই। কেউ ওকে ভয় পায় না। ও নিজেও লোকের দেওয়া দুঃখ মানে না, মানুষকে ভয় পায় না। আমার ভক্ত হর্ষ, শোক, ভয়, ইত্যাদি থেকে মুক্ত। তার কোন ইচ্ছা হয় না, সে পবিত্র, সবার কুশলকারী। বড় বড় কাজের সূচনাকে ত্যাগ করে। সে নিশ্চিত দৃঢ়তায় শুভ বা অশুভ পরিণামকে ত্যাগ করে। অর্থাৎ সে বিষয়ে অবিচল থাকে। তার ক্ষেত্রে কে শত্রু, আর কে মিত্র? তার মানই বা

কি, অপমানই বা কি? ও তো মৌন থেকে যা মিলে যায়, তাতেই সন্তুষ্ট হয়ে সকল পরিস্থিতিতে স্বীয় আত্মশক্তি বলে অবিচল থাকে। এভাবে শ্রদ্ধানম্র থেকে চলমান মানুষই আমার প্রিয় ভক্ত।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, 13 নভেম্বর 1930

30

গীতাকথক

"হরিজন"-এর পাঠক জানেন, গীতা আমার কাছে কত মহান। চিরদিন মেনেছি, গীতা সদৃশ গ্রন্থ মুখস্থ করা খুবই বাঞ্ছনীয়। তবু নিজে, অনেক চেষ্টা করেও গীতা-র সব অধ্যায় কণ্ঠস্থ করতে পারিনি। জানি, স্মৃতিশক্তির ব্যাপারে আমি কত দুর্বল। তাই যখনি এমন কোন মানুষ পাই, গীতা যাঁর কণ্ঠস্থ, মনে তাঁর প্রতি সম্মান জাগে। তামিলনাদ ভ্রমণ কালে এমন দু'জন মানুষকে পেয়েছিলাম। মাদুরায় এক সজ্জন, আর দেবকোট্টায় এক মহিলা। মাদুরায় ব্যক্তিটি এক ব্যবসায়ী, একান্ত খ্যাতিহীন মানুষ। মহিলার নাম পার্বতীবাই। তিনি ন্যায়মূর্তি সদাশিব আয়ারের কন্যা। শ্রী আয়ার তাঁর জীবৎকালে "গীতা" কণ্ঠস্থকারীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ গীতাকথককে প্রতি বছর এক পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। তবে আমি চাই, এই গীতাকথকদের এ বিশ্বাসও থাকা উচিত, শুধু গীতা আবৃত্তি করলেই লাভ হবে না। গীতা-র অন্তর্নিহিত বার্তা মনন ও হৃদয়ংগম করার সহায়ক হয়ে ওঠে। এমন ভাবেই গীতা আবৃত্তি করা দরকার। নিরন্তর অভ্যাস করালে তোতা পাখিও গীতা আওড়াতে পারে। কিন্তু তেমন গীতা পাঠের পরেও তোতা তোতাই থেকে যাবে। তার মধ্যে কোন জ্ঞানোদয় হবে না। গীতাকথককে, গীতাকারের অভীপ্সা অনুযায়ী ব্যাপক অর্থে এক যোগী হতে হবে। গীতা চায় স্বীয় মন, বচন ও কর্মে ভারসাম্য, এই তিনের মধ্যে পূর্ণ সামঞ্জস্য। যার কথা ও কাজ, আর মনে মিল নেই, সে হয় প্রবঞ্চক, নয় পাষণ্ড।

হরিজন, 2 ফেব্রুয়ারী 1934
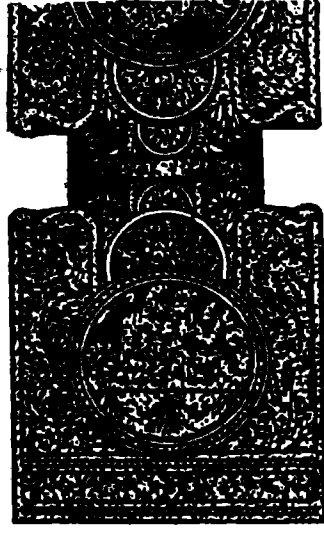
31

আমেদাবাদ হরিজন আশ্রমে ভাষণ

আমি তো গীতা-ভক্ত, এবং দৃঢ় বিশ্বাস আছে কর্মের অটল সিদ্ধান্তে। কারণ না থাকলে তুচ্ছাতিতুচ্ছ কথাও ওঠে না। যে মন-বচন ও কর্মে গীতা অনুসরণের চেষ্ঠা করছে, তার কোন অসুখ হবে কেন, এ আমি বুঝে পাই না। ডাক্তারেরা বলেন, উচ্চ রক্তচাপের কারণ অত্যাধিক মানসিক শ্রম ও উদ্বেগ। এ কথা যদি সঠিক হয়, তাহ'লে সম্ভবত আমি বৃথা চিন্তা করি ও ব্যাকুল হই। ওদিকে গোপনে মনে লালন করি কাম ও ক্রোধ। আমার শত চেষ্টা সত্ত্বেও কোন কথা বা ঘটনা যদি আমার মনের শান্তি ভঙ্গ করে, তার মানে তো এই নয়, যে গীতা-র আদর্শে কোন দোষ আছে। তখন এটাই বুঝতে হবে যে, আমার শ্রদ্ধায় কোন খামতি ছিল। গীতা-র আদর্শ চিরকালের জন্যই সত্য। আমার গীতা বুঝতে, তার নির্দেশ পালন করতে কোন ভুল হয়ে থাকতে পারে।

হরিজন, 29 ফেব্রুয়ারী 1936

32

অহিংসা

যখন কোন মানুষ দাবি করেন যে তিনি অহিংসাবাদী,—তখন আশা জাগে যে, তাঁর কোন ক্ষতি হয়। তিনি ক্ষতিকারীর ওপর চটবেন না, তাঁর লোকসান চাইবেন না,—তাঁর ভালো চাইবেন,—কুবাক্য বলবেন না তাঁকে,—কোন ভাবেই তাঁর শরীরে আঘাত করবেন না। অন্যায়কারী কৃত সকল ক্ষতিও তিনি সইবেন। এমন অহিংসা হ'ল পূর্ণ নির্দোষের অবস্থা। পূর্ণ অহিংসার অর্থ, —প্রাণী মাত্রের প্রতি দ্বেষের সম্পূর্ণ অভাব। তাই অহিংসায়, মনুষ্যত্বের সকল প্রাণী, বিষাক্ত পোকামাকড়, এবং পশুরও স্থান আছে। আমাদের বিধ্বংসী প্রবৃত্তিকে লালন পালন করার উদ্দেশ্যে ওদের সৃষ্টি হয়নি। সৃষ্টি কেন, তা যদি সৃষ্টিকর্তা বুঝিয়ে দিতেন, আমরা জেনে যেতাম তাঁর সৃষ্টিতে এ সব জীবের ন্যায্য জায়গা কোথায়। অহিংসার সকর্মক রূপটি কি? প্রাণীমাত্রের প্রতি সদ্‌ভাব। সেই তো বিশুদ্ধ প্রেম। কী হিন্দুশ্রাস্ত্র, কী বাইবেল, কী কোরাণ, সর্বত্র তো আমি তাই দেখেছি।

অহিংসা এক পূর্ণাবস্থা। সমগ্র মানবসমাজ ওই লক্ষ্যের দিকেই চলেছে, সে স্বভাবত হোক, বা অজানিতে। মানুষ যখন স্বীয় নির্দোষ রূপের সাক্ষাৎ মূর্তি পরিগ্রহ করে, তখন সে কোন দেবতা হয়ে ওঠে না। বহু খাঁটি মানুষ ওই অবস্থায় পৌঁছন। আজ আমরা খানিক মানুষ, খানিক পশু। ঘুসির পিঠে ঘুসি মারি। সে সময়ে দাঁত দাঁতে পিষি। দর্প ও অজ্ঞতা বশে বলি, মানব জাতির সার্থক চেহারা এটাই। কাপট্যবশে বলি, প্রতিহিংসা মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। ওটি বাদ দিলে

চলবে না। এর প্রত্যুত্তরে বলি ধর্মগ্রন্থে তো দেখিনি যে প্রতিহিংসাকে এক অবশ্য কর্তব্য কোথাও বলা হয় নি, অনুমোদন করা হয়েছে মাত্র। সংযমই অমোঘ কর্তব্য। প্রতিহিংসা এমন এক প্রক্রিয়া, যা মানতে গেলে অসংখ্য বড় ও ছোট নিয়ম মনে রাখতে হয়। সংযম জীবনকে দেয় সহজ-সরল গতি। পূর্ণ সংযম ব্যতীত মানুষ পূর্ণাবস্থায় পৌঁছতে পারে না। তেমনই মানব জাতির বিশেষ ধর্মই হ'ল সহনশীলতা ও সংযম।

অভীষ্ট সর্বদা দূরে চলে যাচ্ছে। আমাদের অযোগ্যতা বেশি করে ধরা পড়ছে। প্রযত্নেই সন্তুষ্টি। অভীষ্ট সিদ্ধিতে নয়। পূর্ণ প্রযত্নই পূর্ণ জয়।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, 9 মার্চ 1922

33

হিন্দুও বিমুখ

যেহেতু আমি পূর্ণ অহিংসায় বিশ্বাসী, তার প্রবক্তা, তাই কিছু লোক আমাকে হিন্দু বলে মানতেও নারাজ। তারা বলে আমি এক প্রচ্ছন্ত খ্রীষ্টান। একথাও আমাকে জোরের সঙ্গে বলা হয়েছে যে আমি নাকি গীতার অর্থকে কদর্থ করি যখন গীতার সেই সমস্ত মহৎ শ্লোকের মধ্যে আমি নির্ভেজাল অহিংসার শিক্ষা খুঁজে পাই। আমার কয়েকজন হিন্দু বন্ধু একথাও বলেছেন যে, কিছু কিছু ক্ষেত্রবিশেষে হত্যাকাণ্ডকেও গীতা সমর্থন করে।

এক উদ্‌ভট বিদ্বান সজ্জন আমার গীতা ব্যাখ্যা বিষয়ে নাক-মুখ সিঁটকে বলেছেন, গীতা ব্যাপারে কিছু টীকাকারের এ মতামত অর্থহীন যে, গীতা হ'ল শুভ ও অশুভের চিরন্তন সংঘর্ষের চিত্র। বলেছেন, নিঃসংকোচে, কোন দুর্বলতা না দেখিয়ে আমাদের অন্তর্স্থিত অশুভকে দূর করাই আমাদের কর্তব্য, গীতার বক্তব্য এই।

অহিংসা বিরোধী এ সব মতামত কিছু খুলে মেলে জানানো প্রয়োজন যে, সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের বিষয়ে আমি যা বলব, মানুষ যদি তা বুঝতে চায়, তবে এ সব মতামত মনে রাখা জরুরি।

আজ চারদিকে দেখছি অহিংসা প্রসারের বিরোধী প্রতিক্রিয়া। মনে হচ্ছে, হিংসার এক বিধ্বংসী তরঙ্গ ধেয়ে আসছে। হিন্দু-মুসলিমের এ উত্তেজনা অহিংসায় বীতশ্রদ্ধার এক উগ্ররূপ।

এ প্রসঙ্গ বিচার করার সময়ে আমার কথা বিবেচনা করতে হবে না। আমার ধর্ম তো আমার, ও আমার স্রষ্টার মধ্যে নিবদ্ধ। যদি হিন্দু হই, সমস্ত হিন্দুসমাজ বহিষ্কার করে দিলেও আমি হিন্দুই থাকব। এ কথা তো বলেই চলব যে, ধর্মের পরিণাম অহিংসা।

কিন্তু আমি মানুষের সামনে অহিংসার সেই পরম রূপটি কখনো তুলে ধরিনি। হয়তো তার কারণ এই যে, এই সুপ্রাচীন বার্তাটি সমাজ সমক্ষে তুলে ধরার যোগ্যতাই নেই আমার। বুদ্ধিগত ভাবে আমি অহিংসার সে পরম রূপটি বুঝেছি, গ্রহণও করেছি। কিন্তু এখনো তা আমার প্রতি লোমকূপে প্রবেশ করেনি। যা আমি স্বজীবনে বার বার আচরণ করিনি, লোককে তা করতে বলি না, আমার শক্তির আধার এ টুকুই। আজ নিজ দেশবাসী ভাইদের কাছে অনুরোধ, শুধু দুটি উদ্দেশ্যে অহিংসাকে অন্তিম ধর্ম রূপে মেনে নিন। এক, বিভিন্ন জাতির পারস্পরিক সম্বন্ধকে নিয়ন্ত্রণের জন্য। দুই, স্বরাজ পাবার জন্য। হিন্দু, মুসলমান খ্রিষ্টান, শিখ ও পার্সী, নিজেদের মতভেদ সমাধানে হিংসার আশ্রয় নেবেন না। আর, অহিংস পদ্ধতিতেই স্বরাজ পেতে হবে। ভারতের সামনে সাহসভরে আমি এ প্রস্তাব রাখছি। এটা দুর্বলের হাতিয়ার নয়, বলবানের। ধর্মের ক্ষেত্রে কোন জোর-জবরদস্তি নয়। এ নিয়ে হিন্দু ও মুসমলানের কথা তো অনেকে বলেন। কিন্তু কোন হিন্দু একটি গরুর প্রাণ বাঁচাবার জন্য কোন মুসলমানকে হত্যা করলে তাকে জবরদস্তি ছাড়া আর কি বলা যাবে? কোন মুসলমানকে জোর করে হিন্দু বানাবার চেষ্টাও করা হয়েছে। হিন্দুরা মসজিদের সামনে গানবাজনা করলে, মুসলমানরা যদি জোর করে তা থামাবার চেষ্টা করে, সেটা জবরদস্তি ছাড়া অন্য কিছু কি? কোলাহলের মধ্যেও মানুষ পরমাত্মার ধ্যানে ডুবে যায়। তাতেই তো মঙ্গল নিহিত। অন্যে আমার ধার্মিক বিশ্বসের বিষয়ে সচেতন থাকুক। এ জন্য আমরা জোর-জবরদস্তি করলে, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আমাদের অধার্মিক বর্বর মনে করবে। এক লক্ষ ইংরেজদের চৈতন্যোদয় করাবার জন্য ত্রিশ কোটি ভারতবাসীকে যদি হিংসাশ্রয়ী কাজে নামতে হয়, সে তো লজ্জার কথা। ওদের হৃদয় পরিবর্তন করতে বা নিজেদের ইচ্ছা মতো ওদের এদেশ থেকে তাড়াতেই যদি হয়, আমাদের মনোবল চাই, অস্ত্রবল নয়। আমাদের এ মনোবল না জাগলে অস্ত্রবলও জোগাড় করতে পারব না। মনোবল জাগলে দেখব, অস্ত্রবল দরকার নেই।

আমাদের রাষ্ট্রীয় অস্তিত্বের জন্য সবচেয়ে স্বাভাবিক ও জরুরী শর্ত হ'ল, উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অহিংসা-ধর্মকে মেনে নেওয়া। তখন সমাজের দেহ

শক্তিকেও অপেক্ষাকৃত ভাল কাজে লাগাতে শিখব আমরা। আজ ভাইয়ে ভাইয়ে নিরর্থক লড়াইয়ে আমরা দেহশক্তি ক্ষয় করছি। এ লড়াই দু' দলই ধ্বংস ও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। যতদিন সম্পূর্ণ দেশের সমর্থন না পাই, ততদিন সশস্ত্র-বিদ্রাহ এক পাগলামি। সে অনুমোদন পেলে, এক বিন্দু রক্তপাত না করেই অসহযোগ আন্দোলন আমাদের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারবে।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, 29 মে 1924

34

ধর্মান্তকরণ হয় না

বিলাতি সংবাদপত্রের কাটিংয়ে নানা খোশখবরের মধ্যে একটি হল, যাঁকে মীরাবাই ডাকা হয়, সেই কুমারী স্লেড হিন্দুধর্ম গ্রহণ করছেন। আমি বলতে চাই, তিনি তা করেন নি। আমার আশা, চার বছর আগে যখন উনি আশ্রমে আসেন, তখনকার চেয়ে আজ উনি আরো ভাল আর সাচ্চা এক খ্রিষ্টান। উনি কোন নাবালিকা নন। কুড়ির ওপরে বয়স ওঁর। মিশর, ফ্রান্স, তথা ইউরোপে ওখানকার বৃক্ষ ও প্রাণীদের সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্ক স্থাপনের কাজে একা একাই ঘুরেছেন।

আমার সৌভাগ্য, আমার হেফাজতে কমবয়সী মুসলমান, খ্রিষ্টান ও পারসী স্ত্রী-পুরুষকে রাখার সুযোগ পেয়েছি। হিন্দুধর্ম গ্রহণ করতে বলা হয়নি কাউকে কোনদিন। ওঁদের উৎসাহ ও প্রেরণা দেওয়া হয়েছে, যাতে যে-যার ধর্মগ্রন্থ পড়েন।

আজও আমি বড় প্রসন্ন মনে সেদিনের সাথীদের, সেইসব স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকাদের উদাহরণ মনে করতে পারি। নিজ ধর্মকে আগের চেয়ে বেশি ভালবাসা, তাকে খুঁটিয়ে বোঝা শেখানো গিয়েছিল তাঁদের। অন্য ধর্মচর্চা, তার প্রতি সহানুভূতি ও ভালবাসা, সে শিক্ষাও দেয়া গিয়েছিল।

আজও আশ্রমে কয়েক ধর্মের মানুষ থাকেন। কোন রকম ধর্মান্তকরণ তো করা হয় না। সে অনুমতিও দেয়া হয় না।

আমি বিশ্বাস করি, সব ধর্মই সাচ্চা, ও দৈবী প্রেরণার ফল। তবে অপূর্ণ

মানুষরা, অসম্পূর্ণ মানুষদের দিয়ে ধর্মাচরণ পালন করায় বলে তাতে কিছু মন্দ জিনিস ঢুকেছে। কুমারী স্লেড হিন্দু নাম গ্রহণ করেন নি। ভারতীয় নাম গ্রহণ করেছেন। ওঁকে ডাকার ও অন্যান্য সুবিধার জন্য ও নাম রাখা হয়েছে।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, 20 ফেব্রুয়ারী 1930

35

জনৈক খ্রিষ্টানের চিঠি

হিন্দুধর্মে যিশুরও স্থান আছে। সে বিষয়ে আমি আরো আশ্বাস সহকারে আপনার মত সমর্থন করতে গিয়ে বলব, হ্যাঁ, হিন্দুধর্মে যিশুর জন্যও স্থান আছে। যেমন মহম্মদ, জরাথুস্ত্র আর মুসার স্থান আছে। আমার চোখে বিশ্বের বিভিন্ন ধর্ম একটি বাগানে প্রস্ফুটিত সুন্দর ফুল, অথবা একই বিশাল গাছের শাখারাজির মত। এ সবগুলিই একই রকম সত্য। মানুষের মধ্যেই ধর্ম আশ্রিত। ধর্মের ব্যাখ্যা মানুষই করেছে। তাই সকল অসম্পূর্ণ মানবই সমান।

ভারত ও অন্যত্র যে ভাবে মানুষ ধর্মান্তকরণ করছে, তাকে কোন সমর্থন জানানো আমার পক্ষে অসম্ভব। এ আমাদের এক বিশাল ভ্রান্তি। সংসারে শান্তির পথে এগোবার সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক। "পরস্পর যুদ্ধরত ধর্ম", এমন শব্দের প্রয়োগও নিজেই নিজ ধর্মের নিন্দা করা।

কিন্তু আজ ভারতে, যেখানে ধর্ম বা ধর্মীয় সকলকে জননী বলে মানি, সেখানে যে অবস্থা চলছে, তাকে বর্ণনা করতে হলে ওই শব্দই উপযুক্ততম। ধর্ম যদি জননী হন, জননীকে আমরা বাজারে নামিয়েছি। কোন খ্রিষ্টান কোন হিন্দুকে খ্রিষ্টান বানাতে চায় কেন, কোন হিন্দু কেন চায় এক খ্রিষ্টানকে হিন্দু বানাতে? হিন্দুটি যদি সৎ ও ঈশ্বরপরায়ণ হয়, তাতেই কেন সে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না? মানুষের শীলতা ও নৈতিকতার কোন মহত্ব যদি না থাকে, তবে গির্জা, বা মসজিদ, বা মন্দিরে কোন বিশেষ পদ্ধতিতে উপাসনা করা এক অন্তঃসারহীন

রীতি ছাড়া কিছু নয়।

তেমন মানুষ এ সমাজের বিকাশের পথে প্রতিবন্ধক। কোন বিশেষ পদ্ধতিতে আগ্রহী থাকা, কোন ধর্মীয় রীতি বারবার আচরণ করা; এমন উগ্র ঝগড়ার ভীষণ কারণ হতে পারে। তার পরিণাম হবে ভয়ংকর রক্তপাতে এবং ধর্মে, অর্থাৎ ঈশ্বরে এ সব লোকের বিশ্বাস একেবারে চলে যাবে।

হরিজন, 30 জানুয়ারী 1937

36

সি. এফ. এণ্ড্রুজের সঙ্গে আলোচনা

সি. এফ. এণ্ড্রুজ : মনে করুন, কেউ খুব ভাবনাচিন্তা করে, পথ প্রদর্শনের জন্য প্রভুর কাছে প্রার্থনা করার পর বলল, যিশু ছাড়া আমার শান্তি ও মুক্তি নেই। আপনি কি বলবেন?

গান্ধীজী : যদি কোন অখ্রিষ্টান ধরুন কোন হিন্দু, যিশুর কাছে এমন কথা বলে, তো আমি বলব, ধর্ম পরিবর্তনে স্বকল্যান খোঁজার বদলে এক ভালো হিন্দু হয়ে ওঠা দরকার।

এণ্ড্রুজ : এ ব্যাপারে আপনার সঙ্গে পুরোপুরি একমত হতে পারছি না। আপনি আমার মনোভাব জানেন। যিশুর শরণ না নিলে মানুষের মুক্তি নেই। এ বিশ্বাস তো আমি কবেই ত্যাগ করেছি। তবে ধরুন, অক্সফোর্ড গ্রুপ আন্দোলনের সদস্য আপনার ছেলের জীবন পালটে দিয়েছে, ভাবছে তার খ্রিষ্টান হওয়া উচিত, তখন আপনি কি বলবেন?

গান্ধীজী : আমি তো বলব, অক্সফোর্ড গ্রুপ জীবন যত চায় বদলে দিক, কিন্তু তাদের কারো ধর্মান্তরা করা ঠিক নয়। ওরা বলতে পারে, স্ব-স্ব ধর্মের সর্বোত্তম তত্ত্বে অভিনিবিষ্ট হও, সেই মতে জীবন-যাপন করো। একদিন একটি লোক এল আমার কাছে। তার মা-বাবা ব্রাহ্ম। সে আমাকে বলল, আপনার (এণ্ড্রুজের) বই পড়ে ও খ্রিষ্টান ধর্ম নেবার প্রেরণা পেয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ও কি পূর্বপুরুষদের ধর্মকে ভ্রান্ত মনে করে? জবাবে ও বলল, "না।" তখন আমি

বললাম, "বাইবেল পৃথিবীর এক শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ এবং ঈশামসীকে এক মহান ধর্মগুরু বলে মানতে তোমার অসুবিধা আছে?" আমি তাকে বললাম, আপনি (এণ্ড্রুজ) আপনার বইয়ে কোথাও বলেন নি, ভারতীয়রা বাইবেল গ্রহণ করুক ও খ্রিষ্টান হোক। ও আপনার বইয়ের ভুল অর্থ করেছে। তবে আপনার বিচার যদি স্বর্গীয় মৌলানা মুহম্মদ আলির চিন্তানুযায়ী ওই রকম হয় যে, 'একজন ধর্মবিশ্বাসী মুসলমান—তার জীবন-যাপন যতই মন্দ হোক না কেন—একজন মহৎ হিন্দুর চাইতে ভাল'—তাহলে স্বতন্ত্র কথা।

এণ্ড্রুজ : আমি মৌলানা মুহম্মদ আলির রায় মানি না। তবে এটা নিশ্চয় বলি, যদি কেউ নিজ ধর্ম বদলাবার প্রয়োজন সত্যই অনুভব করে, আমি তার পথে বাধা দিতে চাইব না।

গান্ধীজী : কিন্তু এটা দেখবেন না যে, লোকটা নিজ অবস্থা নিয়ে আরেকবার ভাবুক সে সুযোগ দেওয়া উচিত? আপনি তাকে কিছু সওয়াল-জবাবও করছেন না। দেখুন, কোন খ্রিষ্টান ধরুন আমার কাছে এসে বলল, "ভগবত" পড়ে ও মুগ্ধ হয়ে গেছে। তাই হিন্দু হতে চায়। তখন আমি তাকে বলব, "না ভাই, না। যা আছে "ভাগবত"-এ, তাই আছে "বাইবেলে"। এখনাবধি তুমি তা খুঁজে দেখার চেষ্টা করনি। চেষ্টা করো, ভালো খ্রিষ্টান হয়ে ওঠ।"

এণ্ড্রুজ : আপনি যা বললেন, সে বিষয়েও আমি কোন রায় দিতে পারি না। তবে আমাকে যদি কেউ বলে, সে ভালো খ্রিষ্টান হতে চায়,—আমি বলব, "তোমার ইচ্ছা থাকে, তো হও।" আপনি নিশ্চয় জানেন, ধর্মান্তরিত হবার তীব্র ইচ্ছা নিয়ে যারা আমার কাছে আসে, আমি তাদের মানা করি। বলি, "ঠিক আছে, তবে আপনি এ কাজ করলে, আমি নিমিত্তের ভাগী হব না।" তবে মানব স্বভাব এমন, যে মানুষের মনকে ধরে রাখতে পারে, এমন এক বলিষ্ঠ ধর্মের প্রয়োজন হয়।

গান্ধীজী : কেউ বাইবেলে বিশ্বাস করতে চায় তো করুক। তবে স্ব-ধর্ম বদলাবে কেন? ধর্ম-প্রচারের ওই প্রবৃত্তি থেকে সংসারে স্থায়ী শান্তি আসবে না। ধর্ম একেবারেই নিজের ব্যাপার। আমাদের তো নিজেরা যেমন যেমন বুঝি, যা ঠিক মনে হয়, সেই মতে জীবন-যাপন করা,—একে অপরের ধর্মের ভালোটুকু নিয়ে পরস্পর আদান-প্রদান করা, এই উচিত। ঈশ্বর সামীপ্যে পৌঁছবার জন্য মানুষের যে সাধনা, তাতে নিজ-নিজ সামর্থ অনুযায়ী যোগ দেওয়া উচিত।

ভেবে দেখুন, দুইয়ের মধ্যে আপনি কোনটি সমর্থন করেন,—সকল ধর্ম

অনুযায়ী একে অপরের ধর্ম বিষয়ে সহিষ্ণু হব, না সকল ধর্মকে সমান বলে মানব? আমার বিচারে পৃথিবীর সব ধর্মই তত্ত্বগতদিকে সমান। আমাদের নিজ ধর্মের মতো অন্যের ধর্মের প্রতিও সম্মানের মনোভাব থাকা দরকার। লক্ষ্য রাখবেন, ধর্ম সহিষ্ণুতা নয়, সমান সম্মান দেবার মনোভাব।

হরিজন, 28 নভেম্বর 1936

37

হিন্দুধর্ম সম্পর্কে খ্রিষ্টানদের দৃষ্টিভঙ্গি

আমার মনে হচ্ছে, আজকাল খ্রিষ্টান বন্ধুরা মুখে বলছেন না যে হিন্দুধর্ম এক মিথ্যা ধর্ম। তবু, হিন্দুধর্ম সত্য ধর্ম নয়, খ্রিষ্টধর্মই একমাত্র সত্য, যেমনটি ওঁরা বুঝেছেন,—এই মনোভাবটি ওঁদের হৃদয়ে দৃঢ় হয়ে রয়েছে। ওঁদের এই মনোভাব সেই উদাহরণে প্রকট হবে, যা আমি কিছুকাল আগে "হরিজন"-এ সী. এম. এস.-এর আপীলে লিখেছিলাম। যতদিন এটা মানা হবে না, যে ওই অশ্লীলের পিছনে একই মনোবৃত্তি কাজ করছে, ততদিন তার তারিফ করা তো দূরের কথা, তা বোঝাও যাবে না। হিন্দু সমাজের অস্পৃশ্যতা, বা অনুরূপ ভ্রান্তির ওপর কেউ কশাঘাত করে, তো সেটা বোঝা যায়। এই বিদ্যমান অন্যায়কে দূর করা, আমাদের ধর্ম সংস্কারে সহয়তা করা, সে এমন এক সৃষ্টিশীল কাজ হবে, যা খুবই দরকার। তা আমরা সকৃতজ্ঞ মনে মেনেও নেব। কিন্তু আজ যে প্রচেষ্টা চলছে, তা থেকে দেখা যাচ্ছে যে এ হ'ল হিন্দুধর্মকে আমূল উচ্ছেদ করে, তার জায়গায় অন্য ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করার তোরজোর। যেন কোন পুরনো বাড়ির মেরামত দরকার। সেটি থাকার পক্ষে ভালো, অনেকদিন চলবেও। তাকেই কেউ ধূলিসাৎ করতে চাইছে। কেউ গিয়ে যদি বাড়ির মালিককে বোঝায়, বাড়িটির কোথায় সংস্কার, কোথায় মেরামতি দরকার, তাহ'লে বাড়ির মালিক যে তাঁকে স্বাগত জানাবেন, তাতে ভুল নেই। তবে কেউ যদি এমন বাড়িও ভাঙতে থাকে, যাতে গৃহস্বামীর পূর্বপুরুষরাও বাস করছেন,—তাহ'লে গৃহস্বামী এমন কাজ

করনেওয়ালার বিরুদ্ধে উচিত ব্যবস্থা করবেন।

যদি গৃহস্বামীর বিশ্বাস হয় যে মেরামত করলেও কাজ হবে না, ও বাড়ি আর বাসযোগ্য নেই, সে কথা আলাদা। হিন্দুধর্ম বিষয়ে খ্রিষ্টান ধর্মজগতের মত যদি এই হয়, তবে তো "সর্ব-ধর্ম সম্মেলন", আর "অন্তঃরাষ্ট্রীয় বিশ্ববন্ধুত্ব" এসব শব্দ অর্থহীন হয়ে যায়। কেননা, এ দুটি শব্দ সমতাসূচক এবং এমন এক মঞ্চের ধারণা দেয়, যেখানে সবাই সমানে-সমানে একতাবদ্ধ হতে পারে। যেখানে মানদণ্ডে কিছু ধর্ম উচ্চ, কিছু নীচ, কোথাও আছে জ্ঞানের প্রকাশ, কিছু তাতে বঞ্চিত, কিছু সংস্কৃতিবান, কিছু সংস্কৃতিহীন, কিছু অভিজাত, কিছু কুজাত, কিছুর জাত আছে, কিছু জাতের বাইরে, সেখানে সকলের জন্য একটি মঞ্চ কেমন করে হতে পারে? আমার তুলনা দোষদুষ্ট হতে পারে,—অপমানজনক মনে হতে পারে, আমার যুক্তিতেও দোষ থাকতে পারে,—তবু যা বলছি, তা অকাট্য।

হরিজন, 13 মার্চ 1937

38

আর. আর. কীথনের সঙ্গে সংলাপ

গান্ধীজী বলেছেন, সকল ধর্ম শুধু সত্যই নয়, তা সমানও বটে। তাঁর এ কথা বলার কারণ শ্রী কীথন বোঝেন নি। তাঁর মতে শাস্ত্রীয় দৃষ্টি থেকে এ কথা বলা ঠিক হয়নি যে সব ধর্মই সমান। তাহ'লেতো মানুষ, প্রকৃতি উপাসক এবং ঈশ্বরবাদীদের মধ্যেও তুলনা করবে। আমি তো বলি, ধর্মে ধর্মে তুলনা করা ব্যর্থ। সব ধর্মই ঈশ্বর-প্রাপ্তির জন্য ভিন্ন-ভিন্ন পথ মাত্র। আপনার বিবেচনায়, এ বক্তব্যকে আমি আর কোন শব্দে বললে বুঝতে পারব?

গান্ধীজী : ধর্মে ধর্মে তুলনা সম্ভব নয়, আপনার এ কথা একেবারে সঠিক। তবে এ থেকে এ সিদ্ধান্ত কি মেলে যে সকল ধর্মই সমান? প্রতি মানুষ, জন্ম থেকেই স্বতন্ত্র ও সমান। কিন্তু তাদের মধ্যেও, একে অপরের থেকে শারীরিক ও মানসিক, দুই বিচারেই অনেক সবল বা অনেক দুর্বল হতে পারে। সমস্তটা ধরলে দুজনের মধ্যে সমতা নেই। কিন্তু একটি তত্ত্বগত সাম্য তো আছেই। সে হ'ল আমাদের নগ্নতা, আবরণহীনতার অবস্থা। ঈশ্বর আমাকে গান্ধী ও আপনাকে কীথন রূপে মোটেই দেখছেন না। আর এ বিরাট বিশ্বে আমরা কী বা, আমরা তো পরমাণুর থেকেও ক্ষুদ্র, আর পরমাণুদের মতোই আমাদেরও এ প্রশ্ন করা অর্থহীন যে আমাদের মধ্যে কে ছোট আর কে বড়। তত্ত্বগত দৃষ্টিতে আমরা সমান। জাতি, গাত্রবর্ণ, শরীর, মস্তিষ্ক, জলবায়ু, রাষ্ট্রগুলির পার্থক্য, এ তো ক্ষণ-ভঙ্গুর। এ ভাবেই তত্ত্বগত দিকে সকল ধর্মই সমান। আপনি কোরাণ পড়েন, তো তা মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পড়া দরকার। বাইবেল পড়লে অবশ্যই খ্রিষ্টানে

দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। গীতা পড়লে হিন্দুর চোখ দিয়ে পড়ুন। চুলচেরা বিশ্লেষণ এবং কোন ধর্মকে উপহাস করা, কী প্রয়োজন তার? জেনেসিস বা ম্যাথিউর প্রথম অধ্যায়ই দেখুন। তাতে আমরা এক দীর্ঘ বংশতালিকা পড়তে পাই, আর শেষে বলা হয় যিশু জন্মেছিলেন এক কুমারী মাতার গর্ভ থেকে। এখানে এসে আমাদের সামনে দেখি এক অন্ধকারের প্রাচীর। কথাটা বুঝতেই পারি না। কিন্তু আমার তো এ সব এক খ্রিষ্টানের চোখ দিয়ে পড়া এবং বোঝা দরকার।

কীথন : আমাদের বাইবেল-এও তো মুসা ও যিশুর ব্যাপারে আছে। আমাদের কি দুজনকেই সমান বলে মানা উচিত?

গান্ধীজী : হ্যাঁ। কেননা সকলেই পয়গম্বর তুল্য। এ তো একেবারে এক সমতল ভূমি।

কীথন : যদি আমরা আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদের দৃষ্টি থেকে ভাবি, সবই সমান। কিন্তু এ সমতাকে সঠিক ব্যক্ত করতে পারি না, সঠিক ভাবে পরিভাষিত করতেও পারি না।

গান্ধীজী : তাই তো আমি বলি যে, সব ধর্মই সমান সত্য। সবগুলিতে দোষও সমভাবে বিদ্যমান। আপনি যত সূক্ষ্ম বিচার করবেন, তা ততই ইউক্লিডের সরল রেখার নিকট হবে। কিন্তু সে তো প্রকৃত সরল রেখা হতে পারবে না কখনো। ধর্মের বৃক্ষ একটিই, বাইরে থেকে দেখলে তার শাখা-প্রশাখা সমান মাপের নয়। সেগুলি সবই বিকাশমান। যে ব্যক্তি সবচেয়ে বড় ডালটিতে বসে আছে, তার এ দম্ভ করা উচিত নয়, "দেখ! আমার ডালটি অন্য ডালের চেয়ে বড়।" কেউ কারো তুলনায় শ্রেষ্ঠও নয়, তুচ্ছও নয়।

হরিজন, 13 মার্চ 1937

39

আমেদাবাদে দলিত শ্রেণীর সম্মেলনে ভাষণ

আমি সর্বদাই দাবি করেছি যে আমি এক সনাতনী হিন্দু. ধর্মশাস্ত্রের কোন জ্ঞান নেই আমার, এ কথা সত্য নয়। আমি সংস্কৃতের কোন বড় পণ্ডিত নই। বেদ ও উপনিষদ-এর অনুবাদ পড়েছি। ও সব গ্রন্থের অধ্যয়ন পাণ্ডিত্যপূর্ণ নয়। ও বিষয়ে আমার যে জ্ঞান. তা কোন মতেই গভীর নয়। তবে এক হিন্দুর ও সব বই যতটা অধ্যয়ন করা দরকার, তা আমি করেছি। আমার দাবি, আমি ও সবের মর্মের সঙ্গে পরিচিত। 21 বছর বয়স হতে হতে আমি অন্য ধর্মের বইও পড়ে ফেলি।

এক সময়ে আমি হিন্দুধর্ম ও খ্রিষ্টানধর্মের মধ্যেও আন্দোলিত হচ্ছিলাম। যখন মানসিক ভারসাম্য ফিরে পেলাম, অনুভব করলাম. হিন্দুধর্মে থেকেই আমার মুক্তি সম্ভব। তখন থেকে হিন্দুধর্মে আমার শ্রদ্ধা আরো গভীর ও জ্ঞানদীপ্ত হ'ল।

কিন্তু সেদিন বিশ্বাস ছিল, অস্পৃশ্যতা হিন্দুধর্মের অঙ্গ নয়। যদি তাই হয় তাহলে অমন হিন্দুধর্মে কাজ নেই আমার।

এ কথা সত্য যে হিন্দুধর্মে অস্পৃশ্যতাকে পাপ মনে করা হয় না। আমি শাস্ত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কোন বিতর্কে যেতে চাই না। "ভাগবত" বা "মনুস্মৃতি" থেকে প্রমাণ নিয়ে নিজ বক্তব্যকে প্রমাণ করা আমার পক্ষে কঠিন। কিন্তু আমি হিন্দুধর্মের তত্ত্ব বুঝি বলে দাবি করি। অস্পৃশ্যতা অনুমোদন করে হিন্দুধর্ম পাপ করেছে। এতে আমাদেরই পতন হয়েছে। সাম্রাজ্যে আমাদের অবস্থান আজ

শূদ্রের মতন, ব্রাত্য। আমাদের এই ছুঁৎমার্গী মুসলমানদেরও এর আওতায় এনেছে। দক্ষিণ আফ্রিকা, পূর্ব আফ্রিকা এবং কানাডাতেও হিন্দুদের শূদ্রই মনে করা হয়। অস্পৃশ্যতার পাপ থেকেই এ সব দোষ উৎপন্ন হয়েছে।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, 27 এপ্রিল 1921

40

অস্পৃশ্যতার পাপ

ধর্মে অস্পৃশ্যতার পাপ নেই। ওটা শয়তানের একটা চাল। শয়তান সর্বদা শাস্ত্রের দোহাই দেয়। কিন্তু শাস্ত্র তো সত্য ও বিবেকের চেয়ে বড় নয়। বিবেকের পরিশুদ্ধ ও সত্যকে উদ্‌ভাসিত করার জন্যই শাস্ত্র রচিত হয়েছে। বেদে এ রূপ বলিদানের বিধান আছে বলেই আমি কোন নির্দোষ ঘোড়াকে হোমাগ্নিতে নিক্ষেপ করতে রাজী নই। আমার কাছে "বেদ", দৈবী ও অপৌরুষেয়, (বাইবেলে যেমন বলা হয়েছে) "শাস্ত্রের বচনের আক্ষরিক অর্থ করলে সত্যকে হনন করা হয়।" সত্যে নিহিত ভাবনাই সত্যকে প্রকাশ করে। বেদে নিহিত আসল ভাবনা হল, শুচিতা, সত্য, নির্দোষিতা, পবিত্রতা, বিনয়শীলতা, সরলতা, ক্ষমা, ভক্তিমত্তা এবং সেই সব কিছু, যা কোন স্ত্রী বা পুরুষকে উদার ও সাহসী করে। ভাঙ্গিরা দেশের মহান ও মূক সেবক। এদের কুকুরের চেয়েও হীন মনে করে ওদের তিরস্কার করা, ওদের গায়ে থুথু ছিটানো,—এ কাজে কোন উদারতা বা বাহাদুরি নেই।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, 19 জানুয়ারি 1921

41

অকোলায় অস্পৃশ্যতা বিষয়ে ভাষণ

আমার পাশ্চাত্য শিক্ষা আমার অস্পৃশ্যতা বিষয়ক সিদ্ধান্তকে জন্ম দেয়নি। ইংল্যাণ্ড যাবার অনেক আগে, শাস্ত্র অধ্যয়নেরও অনেক আগে এক প্রতিকূল পরিবেশে এ ধারণা জন্মায়। প্রতিকূল এ জন্য যে, এক কট্টর বৈষ্ণব পরিবারে আমার জন্ম হয়। বালক বয়স থেকেই এ বিষয়ে আমি দৃঢ় সিদ্ধান্তে অটল ছিলাম। তারপর হিন্দুধর্মগ্রন্থের তুলনাত্মক অধ্যয়ন ও অনুভব থেকে উপজাত এ সিদ্ধান্ত আরোহি দৃঢ় হয়। আমি বুঝি না, যখন শাস্ত্রে পঞ্চম বর্ণের উল্লেখ নেই, গীতা-তে ব্রাহ্মণ ও ভাঙ্গীকে সমান মনে করবার স্পষ্ট নির্দেশ আছে, তখন, হিন্দুধর্মের কপালে এ কলঙ্কতিলককে কায়েম রাখার জিদে আমরা এমন অন্ধ কেন? ভাঙ্গী ও ব্রাহ্মণকে সমান বলে মানার অর্থ এ নয় যে সাচ্চা ব্রাহ্মণকে আমরা যথোচিত শ্রদ্ধা করব না। এর অর্থ হ'ল, ভাঙ্গীরও অন্যান্য হিন্দুর মতো আমাদের কাছ থেকে সেই সেবা পাবার অধিকার আছে, যা ব্রাহ্মণের আছে। যে কোন অন্য হিন্দুর মতো ভাঙ্গীও তার ছেলেকে পাঠাতে পারে সরকারী স্কুলে, সাধারণের জন্য যে কুয়ো, তা থেকে জল নিতে পারে, মন্দিরে এসে দেবদর্শন করতে পারে।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, 17 ফেব্রয়ারী 1927

42

সহস্রমুখী দানব

আপনারা কি মনে করেন, স্পর্শে বা দর্শনেও দোষ, এটা বৈদিক যুগ থেকেই সমর্থন পেয়ে আসছে?

আমার ততটা বেদজ্ঞান নেই, যে তার জোরে কিছু বলি। কিন্তু বেদের পবিত্রতায় আমার পূর্ণ বিশ্বাস। নিঃসংশয়ে বলতে পারি, স্পর্শে ও দর্শনে দোষের কোন উল্লেখ নেই বেদে। কিন্তু আমার তুলনায় সর্বশ্রী সী. ভি. বৈদ্য আর পণ্ডিত সাতবোলেকর, এঁদের মতো বিদ্বানরা স্বাধিকারেই স্ববক্তব্য বলতে পারেন। তবু আমি এ কথা নিশ্চয় বলব, নৈতিকতা বিরোধী কোন আচরণ যদি বৈদিক যুগ থেকেও অদ্যাবধি চলছে এমন হয়, তা এখনি বর্জন করা উচিত। সে আচরণ বেদকে শ্রদ্ধা করার বিরুদ্ধাচরণ, বৈদিক আচার শাস্ত্রেরও বিরোধী।

আগের চার প্রশ্নের সারাংশ আমি এ ভাবে উল্লেখ করতে পারি :

আপনি কি মানেন না যে, কর্মকাণ্ডের ভিত্তি হল আকর্ষণী শক্তিভিত্তিক নিয়মাবলী? স্পর্শ এবং দর্শন, জন্মাশৌচ ও মৃতাশৌচ সংক্রান্ত নিয়মগুলি মনকে পবিত্র করার জন্য রচিত?

এমন সব বিধানের বেলা এটা বলতে হবে, ওগুলির কম-বেশি উপকারিতা আছে। কিন্তু বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, অন্যশাস্ত্র, পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ, সর্বত্র স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, মনের শুদ্ধতা একটি আন্তর প্রক্রিয়া। শারীরিক প্রক্রিয়াজাত আকর্ষণ-শক্তি, মনের উপর প্রভাববিস্তারকারী সূক্ষ্ম আকর্ষণ-শক্তির তুলনায় কিছু

নয়। যদি বহিশুদ্ধির জন্য কৃত কর্মকাণ্ডের ফলে ব্যক্তি দাম্ভিক হয়ে ওঠে, নিজেকে অন্য মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করে, স্বীয় সাথীদের পশু সমান, বা তার চেয়েও নিকৃষ্ট ভাবে,—তেমন কর্মকাণ্ড আত্মাকে হনন করে।

বিধিনিষেধ যুক্তিসম্মত হওয়া উচিত। তার দ্বারা আত্মার হনন ঘটানো অনুচিত। ছুঁৎমার্গ বিষয়ক নিয়ম আত্মার বিকাশের পথে বিঘ্ন বলেই বিচারিত হয়েছে। তা আবারও হতে পারে। এ নিয়ম, হিন্দুধর্মের উদার ভাবনার সম্পূর্ণ বিপরীত।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, 3 অক্টোবর 1929

43
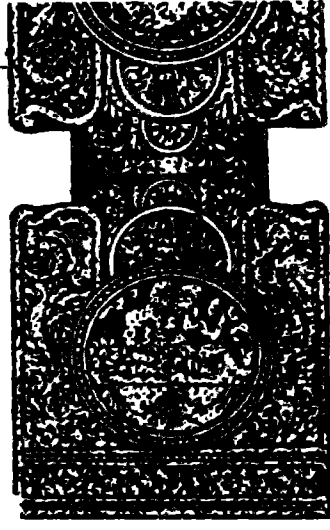
ডঃ আম্বেদকরের দোষারোপন

পাঠকের মনে থাকবে, গত মে মাসে লাহোরে জাত-পাত বিরোধী মণ্ডলের বার্ষিক অধিবেশন হবার কথা ছিল। ডঃ আম্বেদকরের সভাপতিত্ব করার কথা ছিল। কিন্তু ডঃ আম্বেদকর সে জন্য যে স্বাগত ভাষণ তৈরি করেন, স্বাগত সমিতি সেটি মেনে নিতে পারেন নি। তাই ওই অধিবেশন হয়নি।

ডঃ আম্বেদকর স্বাগত সমিতির কাছে হার মানেন নি। প্রতিবাদস্বরূপ উনি ওই ভাষণ নিজের খরচে প্রকাশ করেছেন। আট আনা দাম রেখেছেন তার। আমি বলব, দামটা কম-সে-কম দুই আনা বা চার আনা করলে ঠিক হত।

সে ভাষণ এমন যে, কোন সংস্কারক সেটি উপেক্ষা করতে পারেন না। গোঁড়া লোকরাও এটি পড়ে লাভবান হবেন। এর মানে এই নয় যে, এ ভাষণে আপত্তি করার কিছু নেই। এটি এ জন্য পড়া উচিত, যে জোর আপত্তি উঠতে পারে। ডঃ আম্বেদকর হিন্দুধর্মের কাছে একটি চ্যালেঞ্জ। ওঁর পালন-পোষণ হয় এক হিন্দুরই মতো। এক হিন্দু নৃপতি ওঁকে শিক্ষিত করেন। তারপরেও তাঁর ও তাঁর জাতের মানুষদের সঙ্গে সাবর্ণ হিন্দুদের ব্যবহারে উনি এতই নিরাশ হলেন, যে কেবল সাবর্ণ হিন্দু নয়, হিন্দুধর্মকেও ত্যাগ করার কথা ভাবছেন। ওই ধর্ম ওঁর, এবং সকল হিন্দুদের উত্তরাধিকার। ওই ধর্ম মানেন বলে দাবি করেন, এমন এক দল মানুষের ব্যবহারের জন্য উনি হিন্দুধর্ম বিষয়েই নৈরাশ্যগ্রস্ত।

কিন্তু এতে অবাক হবার কিছু নেই। কেননা কোন প্রথা বা সংস্থাকে, তার

প্রতিনিধিদের ব্যবহার থেকেই বিচার করা চলে। এ ছাড়াও, ডঃ আম্বেদকর দেখেছেন, সংখ্যাগুরু সাবর্ণ হিন্দুরা, আম্বেদকরের জাতভাইদের অস্পৃশ্য বলে গণ্য করেছেন। শুধু নির্মম ও অমানুষিক আচরণ করে ক্ষান্ত হন নি, এর সমর্থনে শাস্ত্র দেখিয়েছেন। যখন ডঃ আম্বেদকরও শাস্ত্র দেখলেন, তখন জানলেন শাস্ত্রে অস্পৃশ্যতা এবং তৎসংক্রান্ত অনেক কথা সত্যই আছে। ডঃ আম্বেদকরের অভিযোগ তিনটি : হরিজনের সঙ্গে নির্দয় ব্যবহার করা হয়; নির্দয় ব্যবহার করে যারা, তারা গভীর নির্লজ্জতায় এমতো আচরণকে সঠিক বলে মনে করে; হিন্দুদের শাস্ত্রে এমন নির্দয় ব্যবহারের সমর্থন আছে। এ অভিযোগের সমর্থনে তিনি শাস্ত্রের অধ্যায় ও শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন।

আমার বিচারে ডঃ আম্বেদকরের সবচেয়ে বড় ভুল হ'ল, উনি যে সব উদাহরণ দিয়েছেন, তার গুরুত্ব এবং প্রামাণিকতা বিষয়ে সন্দেহ আছে। এমন পতনোন্মুখ হিন্দুদের উদাহরণ দিলেন, যারা হিন্দুধর্মের অতীব নিকৃষ্ট প্রতিনিধি। তিনি এমন মানদণ্ড দিয়ে বিচার করছেন, যার সামনে এখনকার কোন জীবিত ধর্মই ধোপে টেঁকে না।

নিজের যোগ্যতাপূর্ণ ভাষণে ডঃ (আম্বেদকর) স্বীয় পক্ষ সমর্থনের চেষ্টায় অতিশয়োক্তির সাহায্য নিয়েছেন। যে ধর্মে চৈতন্য, জ্ঞানদেব, তুকারাম, তিরুবল্লুবর, রামকৃষ্ণ পরমহংস, রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিবেকানন্দ, প্রমুখ অনেক লোক আছেন, যাঁদের নাম মনে আসে। সে ধর্ম কি এমন গুণহীন, যেমনটি ডঃ আম্বেদকর প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন? কোন ধর্মের গুণাগুণ বিচার নিকৃষ্টতম প্রতিভূ দেখে নয়, সর্বোত্তম দেখে করাটাই আদর্শ হতে পারে। যাকে পেছনে ফেলে এগোনো হয়তো যায় না। তবু সে পর্যন্ত পৌঁছবার আকাঙ্ক্ষা তো করা উচিত।

হরিজন, 11 জুলাই 1936